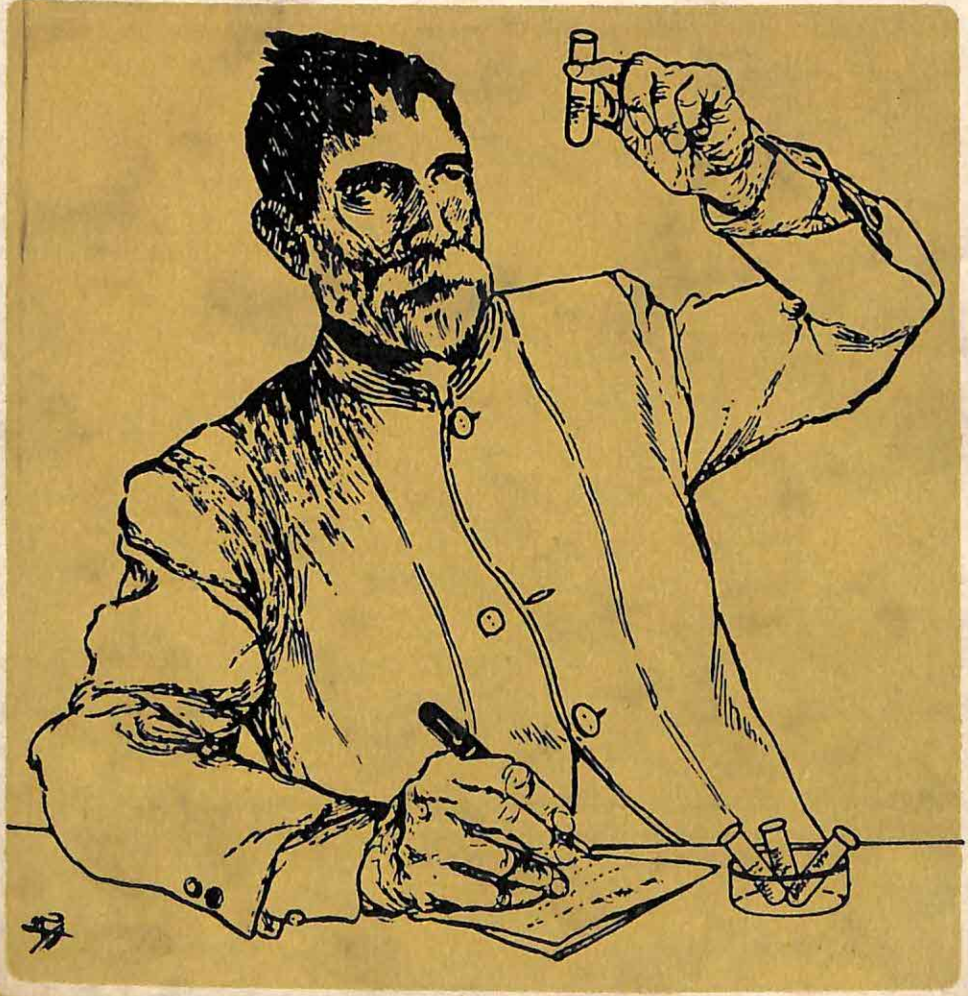
রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

॥ ডঃ বিমলেন্দু মিত্র ॥



লেখক পরিচিতি ঃ

ডঃ বিমলেন্দু মিত্র তিন দশকের বেশি সময় যাবৎ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পদার্থতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা ও শিক্ষকতার কাজে ব্রতী ছিলেন। বিভাগীয় প্রধানের পদে থেকে সম্প্রতি কর্মজীবনে অবসর নিয়েছেন। তিনি কিছুকাল ইংলন্ডের রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক-গবেষক হিসেবে কাটিয়েছেন। ছাত্র ও গবেষক জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন বসুর ছাত্র ; পি.এইচ.ডি. করেন অধ্যক্ষ ডি.এম. বসুর ছাত্র হিসেবে। তাঁর গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ ও রেডিয়েশন ফিজিক্স্। তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ১৯৬০-৬২ তে 'কক্রফ্ট্ ওয়ালটন' শ্রেণীর কণাত্বরক যন্ত্র তৈরি করে '১৪ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট' শক্তির 'নিউট্রন'-জেনারেটর হিসেবে তাকে কাজে লাগিয়ে নিউট্রন-ফিজিক্সে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। সম্প্রতি রেডিয়েশন-ফিজিক্সে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলের কৌতূহল আকর্ষণ করেছে। ডঃ মিত্র বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ; ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির তিনি 'ফেলো' ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ

রসায়নাচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ডঃ বিমলেন্দু মিত্র এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি,
ফেলো, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন
গবেষক-শিক্ষক (রীডার) ও বিভাগীয় প্রধান।

শ্রীভূমি

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ॥
অরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ নভেম্বর, ১৯৮৮

মূল্য ॥ ২৫·০০

মুদ্রাকর ॥
শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

যিনি নিজের জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শকে অতি উচ্চ-স্থান দিয়েছিলেন, যিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সংগ্রহ করা এবং বাঙ্গালীর পরিচালনায় সূতাকল স্থাপন করায় একই রকমের গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ও একাধিক অন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একদা সংগঠক ও অধিকর্তা, আমার আশৈশব পালক পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত সেই ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, এম. এ, বি. এল, পি. আর. এস, পি. এইচ ডি, ডি. লিট (লণ্ডন) মহাশয়ের অনির্বাণ স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের এই জীবনীগ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

বিমলেন্দু মিত্র

ভূমিকা

প্রফুল্লচন্দ্র রায় অবিভক্ত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের উনিশ শতক ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পুরুষদের অন্যতম। প্রায় ১২৭ বছর আগে তাঁর আবির্ভাব এবং দীর্ঘ জীবনের শেষে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। বিভিন্ন সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (প্রথম জীবনী প্রকাশ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রদীপ' [১৮৯৭-৯৮] পত্রিকায়)। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী এত প্রচুর, তাঁর কর্মকাণ্ড এত বিপুল যে সাধারণ কলেবরের কোন একখানি পুস্তকে তার সব কিছু প্রকাশ করা প্রায় অসাধ্য। তিনি শুধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান অন্যতম প্রবীণ বিজ্ঞান গবেষক ও শিক্ষক নন, তিনি এদেশের যুগসন্ধিক্ষণের সামাজিক বিপ্লবের অন্যতম চিন্তাকার, স্বদেশী শিল্পস্থাপন ও বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের অন্যতম পথপ্রদর্শক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট নেতা, শ্রদ্ধেয় সমাজসেবী, মানবদরদী ও সেই সঙ্গে অগ্রণী শিক্ষাবিদ। তাঁর জীবনকালেই তাঁর কীর্তিকাহিনী রূপকাহিনীর মত ঘরে ঘরে ফিরত। দুই মলাটের মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। বর্তমান বইটি লেখার প্রয়োজন বোধ করেছি অবশ্য এজন্যে যে ইতিমধ্যে তাঁর ১২৫-তম জন্মোৎসব হয়ে গেছে, ঐ উপলক্ষে অন্ততঃ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের' তরফ থেকে। বলা বাহুল্য বইটি ইংরেজিতে লেখা। স্থির হয়েছিল, সংগৃহীত নতুন তথ্যের সঙ্গে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা থাকবে এমন একটি মোটামুটি অল্পপরিসরযুক্ত বাংলা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেইজন্যই এই উদ্যোগ। আশা করি বর্তমান যুগের পাঠকমহলেও এই জীবনীগ্রন্থ আদৃত হবে।

বর্তমান রচনার জন্যে তথ্যের আকর হিসেবে নীচের প্রকাশনাগুলি ব্যবহার করেছি; রচনার মধ্যে আলাদা করে অনেক সময়েই এদের উল্লেখ করা দরকার মনে করিনি।

১। Acharya Prafulla Chandra Ray, Some Aspects of his Life and Work; Edited by Santimoy Chatterjee and Amitava Sen, Indian Science News Association, 1986.

২। Acharya Prafulla Chandra Ray, Birth Centenary Souven ir Volume, Calcutta University, 1962.

৩। Acharya Ray & Chemical Research in Modern India, by J. N. Ray; Journal of the Indian Chemical Society, Vol 30, Nr. 8, 1961.

৪। Hundred Years of the Calcutta University, Calcutta University, 1957.

৫। Acharya P. C. Ray 70th Birthday Commemoration Volume, Edited by Hirendranath Dutta, 1931.

এ ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রফুল্ল-জীবনী প্রয়োজনবোধে কাজে লাগিয়েছি ; কাজে লেগেছে পুরনো 'প্রবাসী' মাসিকপত্র।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতী ইলা বিশ্বাস মহাশয়া P. C. Ray 70th Birthday Vol. অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির প্রতিলিপির জন্যে ধন্যবাদার্হ। বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যের জন্যে অধ্যাপক সুনির্মল চন্দ এবং শ্রীমান অরুণ দাশগুপ্তকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

এই বই প্রকাশ সম্ভব করবার জন্যে 'শ্রীভূমি' প্রকাশনা সংস্থার শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই উপলক্ষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে নিবেদন করি, যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রয়ে গেছে। বিশেষতঃ ৭১ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে রাসায়নিক ফরমুলাটির সঠিক চেহারা হবে $Br—C_2H_4\text{-}(SC_2H_4)_{1,2\cdot3,\ldots}—Br$; ৬০ পৃষ্ঠায় একটি তথ্যগত ভুল আছে, ইংরেজের তৎকালীন 'ফ্যাক্টরি' ছিল বাণিজ্যিক কুঠি, 'সুতিকল' নয়। 'সুশ্রুত' অসাবধানতাবশত কখনও বা 'সুশ্রুত' হয়েছে। এ বিষয়ে ত্রুটি স্বীকার করছি।

কলকাতা
ফাল্গুন ১৩৯৪
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

বিমলেন্দু মিত্র

সূচীপত্র

॥ প্রস্তাবনা ॥

বাঙ্গালী সৌভাগ্যবান, কারণ বহু মহান ভারতীয় তার ঘরে জন্ম নিয়েছেন। বিশেষতঃ উনিশের শতকে দেখা যায় যে এমন অসংখ্য রত্নের দ্যুতিতে বাঙ্গালীর ঘর উজ্জ্বল। সেই রত্নরাজির অন্যতম হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যুগল গুরুর তিনি একজন—অন্যজন হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। সে জীবন অসংখ্য বিচিত্র কর্মের জালে ছিল বাঁধা। তাঁর জীবনের সব কথা একটি ছোট বইতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ও তাদের সঠিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা দুরূহ। তার অন্যতম কারণ হল তাঁর বিজ্ঞানকর্ম তাঁর অবিরাম ও প্রভূত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে প্রায়ই ছায়াবৃত হয়ে পড়েছে। তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর গড়ে তোলা ছাত্রমণ্ডলীর গবেষণাকৃতির সঙ্গেই নিজের মৌলিক অবদানকে জড়িয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি কি দিয়ে গেছেন, বেশির ভাগ প্রফুল্ল জীবনীতেই তার আলোচনা অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবিত কালেই রূপকথার রাজপুত্রের মত তাঁর নাম ঘরে ঘরে ফিরত। আবার তাঁর জীবন সায়াহ্নে দেখি বর্ষীয়ান ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রফুল্লচন্দ্র সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে প্রায় উপেক্ষিত অবস্থায় অস্তমিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এই মহান জীবনের বৃত্তান্ত ভুলে গেলে বাঙ্গলার তথা ভারতের, বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথমার্ধের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ের পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এইটুকু প্রস্তাবনা মারফৎ আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত শুরু করতে পারি।

॥ পিতৃপরিচয় ॥

অবিভক্ত বাঙ্গলার যশোর জেলার একটি গ্রাম, নাম রাড়ুলি। সেই গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগষ্ট প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। রাড়ুলি পরে খুলনা জেলার অংশ হয়। গ্রামের এক পাশে কপোতাক্ষ নদ, যে নদকে মাইকেল মধুসূদন তাঁর কবিতার মধ্যে অমর করে গেছেন। অন্যপাশে মাইকেলের মাতুলালয়, কাটপাড়া গ্রাম। গ্রাম দুটি একত্রে 'রাড়ুলি-কাটপাড়া' নামে লোকমুখে পরিচিত। রাড়ুলি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। একটি মতে, 'রায়-আলি' নাম থেকে রাড়ুলি নাম হয়েছে। অন্য মতে বলা হয়, রাড়ুলি এসেছে 'রাহুলী' থেকে।

রায় পরিবার কায়স্থ, তাঁদের পারিবারিক উপাধি 'দেব'। তাঁরা ছিলেন ঐ গ্রামের সচ্ছল, তালুকদার বংশ। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র রায়, মাতার নাম ভুবনমোহিনী। হরিশচন্দ্রের পিতা আনন্দলাল যশোরের কালেক্টরি'র পেশকার ছিলেন, পরে হন সেরেস্তাদার।

হরিশচন্দ্র সেকালের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ক্যাপ্‌টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে ইংরেজী শেখেন। লোকে বলে, রিচার্ডসনের মত ইংরেজীর অধ্যাপক ভারতে আর আসেন নি। স্বনামখ্যাত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় হরিশচন্দ্রকে বাংলা ও সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন। মৌলবীর কাছ থেকে তিনি রীতিমত আরবী ও ফারসী শেখেন। তিনি নাকি অন্তত সাতটি ভাষা জানতেন,—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, কায়েথী হিন্দি, আরবী, ফার্সী ও উর্দু।

প্রফুল্লচন্দ্রেরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও দুই বোন। ভাইদের নাম যথাক্রমে,—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র (বুদ্ধদেব)। দুই বোন,—ইন্দুমতী ও বেলা। বেলা অল্প বয়সেই মারা যান। বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হয়েছিলেন ডায়মণ্ড-হারবার মুন্সেফ কোর্টের উকিল। মেজ নলিনীকান্ত ছিলেন ডাক্তার।

পূর্ণচন্দ্র দেশের বাড়িতেই থাকতেন, জমিজমা দেখাশোনা করতেন। বুদ্ধদেব অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই মারা যান (১৯০৩) ; ইন্দুমতী তার দশবছর আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মা ছিলেন ভাড়াশিমলা গ্রামের নবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কন্যা।

হরিশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সরকারী সাহায্য আদায় করে তিনি রাড়ুলি গ্রামে বাংলা স্কুল খোলেন। স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিল পণ্ডিত মোহনলাল তর্কবাগীশ ও হরিশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও যত্ন।

যথেষ্ট পরিমাণে জমিজমার আয় থাকার জন্যে রায় পরিবারের কারো চাকরি করবার দরকার ছিল না। তবুও হরিশচন্দ্র অল্প কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। প্রথমে যশোরের কালেক্টরিতে প্রধান মুনশি হিসেবে কাজ করেছিলেন ; পরে যখন তিনি কলকাতায় চলে আসেন তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ও পরে নিমক বিভাগের দারোগা হন। অবশেষে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়িতে থেকে বিষয় আশয়ের তদারকি করতেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই হরিশচন্দ্র কলকাতায় যাতায়াত করতেন ; পরে ১৮৭০'এ পাকাপাকিভাবে কলকাতার আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে বাড়িভাড়া করে চলে আসেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও হরিশচন্দ্রের অদম্য উৎসাহ ছিল। স্ত্রী ভুবনমোহিনীর শিক্ষার জন্যে তিনি ইউরোপীয় ও দেশী খ্রীষ্টান মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে ভুবনমোহিনীকে বাঙ্গলা লেখাপড়া শেখাতেন।

হরিশচন্দ্র কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র, বাগ্মী কৃষ্ণদাস পাল, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, এঁরা সকলে হরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন। হরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশীর্বাদ

নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র যেন একটি বালবিধবাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়নি, প্রফুল্লচন্দ্র অকৃতদারই রয়ে গিয়েছিলেন।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ বাল্যশিক্ষা : কলকাতায় উচ্চশিক্ষা ॥

গ্রামের বাড়িতে থাকতেই হরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাড়ুলি মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। ছেলেবেলায় প্রফুল্লচন্দ্র মোটেই শান্তশিষ্ট পড়ুয়া ছেলে ছিলেন না। ছিলেন বেশ দুরন্ত। প্রায়ই স্কুল পালাতেন। তাঁকে ধরে আনবার জন্যে মাষ্টারমশাই গ্রামের ঘরে ঘরে হানা দিতেন। হয়ত শেষে দেখতে পেতেন, কোন গাছের ডালের ফাঁকে লুকিয়ে আছে দুরন্ত বালক।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র যখন সপরিবারে কলকাতা চলে এসে ১৩২ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে চাঁপাতলার কাছে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন তখন প্রফুল্লচন্দ্রকে ভর্তি করা হল হেয়ার স্কুলে। এই শহুরে স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র মনের মত জগৎ খুঁজে পেলেন পাঠ্য কেতাবের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের অজস্র বইয়ের মধ্যে। যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর আমাশয়জনিত সাংঘাতিক রকমের পেটের অসুখ করে। অনেক কষ্টে রোগের হাত থেকে নিস্তার পেলেও প্রফুল্ল-চন্দ্রকে পরবর্তী সারাটা জীবন দুর্বল পাকস্থলীর জন্যে খুব সাবধানে কাটাতে হয়েছে। অজীর্ণ আর নিদ্রাহীনতা রোগ তাঁর চিরকালের সাথী হয়ে দাঁড়াল। রোগ এত বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছিল যে প্রায় দেড়বছর তিনি স্কুলে যেতে পারেন নি। দেশের বাড়িতে গিয়ে টোটকা চিকিৎসাদি করে তিনি ভাল হন। স্কুলের শিক্ষায় বাধা পড়লেও প্রফুল্লচন্দ্র বাড়িতে এ সময়ে লেখাপড়া নিয়েই ডুবে থাকতেন। সেই বয়সেই ইংরেজী চিরায়ত সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারতেন। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক চর্চা করেছেন। পড়তেন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব। বাঙ্গলা ভাষায় লেখা যত বই তখন পাওয়া যেত

প্রায় সবই তাঁর পড়া হয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই বলেছেন, তাঁর রোগটি তাঁর পক্ষে যেন শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

হেয়ার স্কুল ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। তখন অ্যালবার্ট স্কুলের খুব নামডাক। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন ঐ স্কুলের রেক্টর। এই সময়েই অবশ্য স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁকে দেড় বছর দেশের বাড়িতে গিয়ে কাটাতে হয়। আবার স্কুলে ফিরলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। অ্যালবার্ট স্কুল থেকেই ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করলেন। ভাল ফল করায় স্কুলের একটি 'ফাণ্ড' থেকে দু'বছরের জন্যে মাসিক ৫ টাকার বৃত্তি পেলেন।

অ্যালবার্ট স্কুলের ওপরে প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই স্কুলের শিক্ষকদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন,—বিশেষ করে আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রনাথ দাঁ সম্বন্ধে।

এণ্ট্রান্স পাস করবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিখ্যাত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের 'কলেজ বিভাগে' তিনি 'ফাষ্ট আর্টস্' ক্লাসে ভর্তি হলেন। এই কলেজ বিভাগই এখন 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত। মেট্রোপলিটানে তখন স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপনা করছেন। তিনি ছিলেন ইংরেজী 'গদ্যের' অধ্যাপক। পড়াতেন, Morley-কৃত 'Burke' ও স্বয়ং বার্কের লেখা 'Reflections on the French Revolution'। প্রফুল্লচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল,—শিক্ষক মহলেও তিনি বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠলেন। পরের যুগে যিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'রাষ্ট্রনায়ক' নামে, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলেজের ক্লাসের বক্তৃতাও ছিল দেশপ্রেমের আলোয় উজ্জ্বল ;—প্রফুল্লচন্দ্রকেও সেই দেশপ্রেম গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অ্যালবার্ট স্কুলের মাষ্টারমশাইদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন কেশবচন্দ্রের খুব কাছের মানুষ। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শোনেন আর তখন থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কার, জাতিভেদ ও নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই, শিক্ষা ও ধর্মের প্রচার ইত্যাদি কাজে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তাঁদের পরিবার ছিল হিন্দু কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কবে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন তা ঠিক জানা না গেলেও মনে হয় যে কলেজে ঢোকবার সময়েই অর্থাৎ ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় পাস করলেন। ঐ পরীক্ষায় সংস্কৃত ছিল অবশ্যপাঠ্য বিষয়। আবার তখনকার দিনে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদিও পড়তে হত। এই পরীক্ষার পরে বি. এ. স্তরে কলা ও বিজ্ঞান মোটামুটি ভাগ হয়ে যেত A ও B কোর্স নাম নিয়ে। প্রফুল্লচন্দ্র B কোর্স অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। যদিও তাঁর মনের গঠন ও গতি ছিল সাহিত্য ও ইতিহাসের দিকে তবুও বিজ্ঞান-বিভাগ পছন্দ করবার অন্যতম কারণ ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজে আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার সাহেবের রসায়ন বিষয়ে অদ্ভুত ভাল অধ্যাপনা। মেট্রোপলিটানের ছাত্র হলেও রসায়নের ক্লাস করতে হত প্রেসিডেন্সীতে। পেড্‌লারের ক্লাসে রসায়নের প্রায়-যাদুকরী পরীক্ষা দেখে প্রফুল্লচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র তিনি, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কখনও বন্ধ রাখেননি প্রফুল্লচন্দ্র। নিজের চেষ্টাতেই খুব ভাল গ্রীক ও ল্যাটিন শিখেছিলেন। সংস্কৃত তো খুব ভাল জানতেনই। সে সময়ে 'গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি'র (Gilchrist Scholarship) জন্যে একটি পরীক্ষা নেওয়া হত। বৃত্তির মোট পরিমাণ ছিল ৭০০০ টাকা। প্রফুল্লচন্দ্র যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই সকলের অজান্তে এই বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। পরীক্ষা দিতে হলে অন্তত চারটি ভাষায় দখল থাকা দরকার। গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী ও সংস্কৃত, এই

চারটি ভাষায় জ্ঞান নিয়ে তিনি পরীক্ষা দিলেন। পাসও করলেন, ফলে ৭০০০ টাকা বৃত্তির অধিকারী হলেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই বাহাদুরজী নামের অন্য একজন ছাত্রও এই পরীক্ষায় পাস করেছিলেন।

তখনকার কালে ৭০০০ টাকা অনেক টাকা। গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি পেলে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করা যেত। গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি প্রদানকারী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা সম্ভবমত—বিলেতের কোন না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করবার জন্যে "ক্যালিফোর্নিয়া" নামের জাহাজে বিলেতের উদ্দেশ্যে প্রফুল্লচন্দ্র পাড়ি দিলেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় পাস করে গিয়েছিলেন কিনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শ্রীসুনীত কুমার ঘোষ[১] লিখছেন,—"মেট্রোপলিটান কলেজে বঙ্গের অন্যতম রত্ন কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। বড়ই আশ্চর্যের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ বিব্রত বোধ করেন ও পরীক্ষা দিবেন না বলিয়া সংকল্প করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম পূজনীয় জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের আশ্বাসে ও ...... উপদেশে তিনি পরীক্ষার হল হেদুয়ার (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) ধারে জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) উপস্থিত হন ও পরীক্ষার প্রথমার্ধ সমাপনান্তে অপেক্ষমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট নিজ সফলতার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন।"

ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ডাক্তার পি. কে. রায় মহাশয়ের ভাই দ্বারকানাথ রায় (ডি. এন. রায়, যিনি পরে ডাক্তার হিসেবে বিশেষ বিখ্যাত হন)। বিলেতে পাড়ি দেবার ফলে, যতদূর মনে হয়, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করে স্নাতক হবার সময় তাঁর হয়ে ওঠেনি।

১। "স্মৃতিকথা," শ্রীসুনীত কুমার ঘোষ, Acharya Prafulla Chandra Ray Birth Centenary Souvenir Vol., 1962, Calcutta University, পৃষ্ঠা 261.

২

॥ বিলেতে উচ্চশিক্ষা ॥

ইংলণ্ডের উত্তরভাগে, লণ্ডন থেকে সুদূরে, স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বি.এ. ক্লাসে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। এডিনবরা পৌঁছবার পথে কেমব্রিজে দিনকতক কাটিয়ে গেলেন তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়, বন্ধু জগদীশচন্দ্রের অতিথি হয়ে। জগদীশ তখন কেমব্রিজে ক্রাইস্টস্ কলেজের ছাত্র।

এডিনবরায় রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ক্রাম্ ব্রাউন (Crum Brown)। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন রসায়নে সমমাত্রিকতার (isomerism) সূত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গন্ধক পরমাণুযুক্ত জৈব রসায়নের গঠন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বেন্‌জিন অণুতে কিভাবে অন্য পরমাণু জুটি বাঁধে সে সম্বন্ধে তথাকথিত Crum Brown's Rule বা "ক্রাম ব্রাউনের নিয়মের" তিনি হলেন প্রবক্তা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি F. R. S. হন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মেধার জন্যে অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন তাঁকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতেন। এডিনবরায় প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন জেম্‌স্ ওয়াকার, যিনি পরে ক্রাম ব্রাউনের পদে নিযুক্ত হন। তাঁদের সমসাময়িক, সামান্য জুনিয়র ছাত্র ছিলেন আলেকজাণ্ডার স্মিথ ও হিউ মার্শাল। এঁরা দুজনেই পরে বিখ্যাত রসায়নবিদ্ হয়েছিলেন।

এডিনবরায় বি. এ. পড়বার সময়েই প্রফুল্লচন্দ্র হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তখন এডিনবরায় রেক্টর ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট, যিনি ১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলেতে ভারত বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা বা "সেক্রেটারি ফর দি স্টেট অব্ ইণ্ডিয়া" ছিলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড এই সময়ে ঘোষণা করলেন যে "সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও তার পরের ভারতবর্ষ" এই বিষয়ের ওপরে লেখা শ্রেষ্ঠ

প্রবন্ধের জন্যে তিনি একটি পুরস্কার দেবেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক করলেন, তিনিও প্রবন্ধটি লিখবেন। খুব পরিশ্রম করে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস পড়ে তিনি একটি প্রবন্ধ খাড়া করলেন। শুধু ইংরেজী নয়, এজন্যে ঐ বিষয়ে ফরাসী বইটইও প্রচুর পড়েছিলেন তিনি। প্রবন্ধের বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়ম ম্যুইর ও অধ্যাপক মেসন। স্যার উইলিয়মের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কারণ তিনি একসময়ে উত্তরপ্রদেশের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধটি বিচারে প্রথম স্থান না পেলেও এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসেবে নির্বাচিত হল। প্রবন্ধটিতে ব্যঙ্গচ্ছলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নানা তীর্যক মন্তব্য ছিল। প্রিন্সিপ্যাল ম্যুইর কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং ছাত্রসভায় প্রবন্ধটির তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

এডিনবরার এক প্রকাশক, 'ই অ্যাণ্ড এস্ লিভিংস্টোন' প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রথমত ওটি বিতরিত হল। সঙ্গে অনুরোধ ছিল, তারা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে সাহায্য করে। পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণটি সাধারণ্যে বিক্রীর জন্যে ছাড়া হল। তখনকার বিখ্যাত পার্লামেণ্টারিয়ান, ভারত-প্রেমী জন ব্রাইটকে তিনি একখণ্ড উপহার দিলেন। এর সঙ্গে একটি চিঠিও পাঠালেন,—তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বর্মাকে ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত করা আর লবণ শুল্ক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। ব্রাইট চিঠির উত্তর দিলেন। চিঠিতে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের মতকে শ্রদ্ধা জানালেন আর বললেন তাঁর ঐ চিঠি প্রফুল্লচন্দ্র যেমন ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন। প্রফুল্লচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে জন ব্রাইটের চিঠিটি 'লণ্ডন টাইম্‌সে' পাঠিয়ে দিলেন।

একদা প্রভাতে বড় বড় অক্ষরে "ভারতীয় ছাত্রের নিকট জন ব্রাইটের পত্র"—এই শিরোনাম নিয়ে চিঠিটি কাগজে প্রকাশিত হল। 'রয়টার' সেটি ভারতবর্ষেও টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দিল। এই

ঘটনা প্রফুল্লচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে কতটা গুরুত্বপুর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার আলোচনা আমরা পরে করব। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র Essay on India নামে আর একটি পুস্তিকা ছাপেন। এতেও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন পদ্ধতিকে সমালোচনা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের 'কালো খাতায়' তখনই প্রফুল্লচন্দ্রের নাম উঠে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা থেকে বি. এ. পাস করলেন। পাস করবার পরে সিদ্ধান্ত নিলেন, এবারে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই রসায়নে মৌলিক গবেষণার কাজ করবার সুযোগ নেবেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ২৭ বছর বয়সে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডি. এস. সি. লাভ করলেন। তাঁর 'থিসীসের' শিরোনাম ছিল Conjugated ("geparte") Sulphates of the Copper-Magnesium Group : A study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combinations. ডক্টরেট ডিগ্রীর সঙ্গে তিনি Hope Prize নামের স্কলারশিপও পেলেন। এর ফলে বছরে ১০০ পাউণ্ড পাওয়া যাবে। তখনকার দিনে বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড বেশি না হলেও খুব কম টাকাও নয়। এই টাকায় তিনি আরও একবছর বিলেতে থাকতে পারবেন। বিশেষতঃ সেই সময়ে এডিনবরায় দিন চালানর খরচ খুব একটা বেশি ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ছিলেন বিশেষ মিতব্যয়ী। অন্য এক বাঙ্গালী ছাত্র, পার্বতীনাথ দত্তের সঙ্গে একত্রে মেস করে থাকতেন তিনি। পার্বতীনাথ দেশে ফিরে পরে ভূতাত্ত্বিক (Geologist) হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এডিনবরায় ছাত্র হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ সুনাম হয়েছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রফুল্লচন্দ্র সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি ছিলেন প্রধান অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন।

॥ দেশে ফেরার সংকল্প ॥

এডিনবরা থেকে প্রথম ভারতীয় যিনি ডি. এস. সি. হয়েছিলেন তিনি হলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, রসায়ন শাস্ত্রে। অঘোরনাথ হলেন কবি ও দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর পিতা। তিনিও 'হোপ্'প্রাইজ পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বাঙ্গলার বাইরে হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের চাকরি নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। প্রায় দশ বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র ডি. এস. সি. হয়ে দেশে ফেরারই সংকল্প করলেন। তিনি স্থির করলেন, তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগে IES (Indian Education Service)-ভুক্ত অফিসার হিসেবে যোগ দেবেন। এই চাকরিতে নিয়োগ করতেন ভারত সচিব (সেক্রেটারি ফর দি স্টেট অব্ ইণ্ডিয়া) স্বয়ং। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন ও প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়ম ম্যুইর দুজনেই তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ভারত সচিব তাঁকে IES'এর চাকরি দিলেন না। এই চাকরিতে সরাসরি ঢোকা অবশ্য ভারতীদের পক্ষে তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র ভেবেছিলেন, অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের মত বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ যখন তাঁকে যোগ্য বলে প্রশংসা-পত্র দিয়েছেন তখন হয়ত ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগে 'কমিশন' পাওয়া (নিযুক্ত হওয়া) অসম্ভব হবে না। কিন্তু তা হল না।

প্রফুল্লচন্দ্র বুঝলেন, ইংরেজ তাঁকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে গ্রহণ করবে না। এর পিছনে যে গূঢ় কারণ ছিল তা তিনি বোঝেননি। তাঁর লেখা পুস্তিকা, India Before and After Mutiny ইংরেজ আমলারা সুনজরে দেখেনি। ওতে ব্যঙ্গচ্ছলে ইংরেজের ভারত শাসন ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। ইংরেজের বিশ্বাস, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে রাজভক্ত প্রজা নন। তাদের নিজেদের দেশে ইংরেজের সুবিবেচক, সুবিচারপ্রেমী চেহারা দেখে বোঝা অসম্ভব যে ভারত উপনিবেশ শাসনকারী ইংরেজের আসল মূর্তি কি। যাই হোক, সে সময়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি. এইচ. টনি. (Tawney) সাহেব ছুটিতে ইংলণ্ডেই

ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন; করে বললেন, কলকাতায় শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌টের নামে চিঠি দিয়ে তিনি যেন প্রফুল্লচন্দ্রকে অন্ততঃ প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে (বাংলা প্রদেশে) একটি শিক্ষকের পদ দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। টনি সাহেব অবশ্য চিঠি দিলেন। ঐ চিঠি নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরলেন। তখন গ্রীষ্মে লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের দপ্তর দার্জিলিং-এ। তিনি দার্জিলিং-এ দৌড়লেন।

টনি সাহেবের চিঠিতে ছিল যে প্রফুল্লচন্দ্র খুবই ভাল রসায়নবিদ্। কিন্তু ক্রফ্‌ট্ সাহেব তাঁকে চাকরির ভরসা তো দিলেন-ই না বরং তিনি নাকি তামাসা করে মন্তব্য করেছিলেন,—'উনি যদি সত্যিই রসায়নে এত পণ্ডিত হন তো উনি চাকরির চেষ্টা না করে শিল্প-টিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাহলে সেখানে তিনি একদিন ডি. পি. আই.-'এর সমান মাইনেতেই কর্মচারীও রাখতে পারবেন!' কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে ছিল। পরে যখন তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' প্রতিষ্ঠা করেন তখন অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল 'ওয়ার্কসের' ম্যানেজার, প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনস্থ কর্মচারী, সত্যিই তৎকালীন ডি. পি. আই. অপেক্ষা বেশি মাইনে পাচ্ছেন!

ক্রফ্‌ট তাঁকে চাকরি দিলেন না, তবে বললেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

অপেক্ষার কাল দীর্ঘ এক বছর। ইতিমধ্যে বন্ধু জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে 'ট্রাইপস্' ও বি. এস. সি. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছেন। তিনিও ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের চাকরির জন্যে অনেক লড়াই করেছেন। ভাইসরয় লর্ড রিপন নিজে অনুরোধ করায় স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করেছেন। ভারতীয় বলেই সাহেবদের তুলনায় জগদীশচন্দ্রের বেতন অনেক কম ধার্য হয়েছিল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ তিন বছর বেতন বয়কট করেছিলেন। অবশেষে জয়ীও হয়েছিলেন।

জগদীশ ও অবলা বসুর সাদর আমন্ত্রণে প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের মেছুয়াবাজারের ভাড়াটে বাড়িতেই দীর্ঘকালের অতিথি হিসেবে বাস করতে এলেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরের' প্রাক্তন অধ্যক্ষ (১৯৩৮-১৯৬৭) দেবেন্দ্রমোহন বসুর স্মৃতিকথায় পাই,—"আমার বাবা মোহিনী মোহন বসু ও জগদীশচন্দ্র (জগদীশচন্দ্রের ভগ্নী সুবর্ণপ্রভা ছিলেন মোহিনীমোহনের স্ত্রী) ৬৪/২ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বাড়িটি প্রকাণ্ড, একতলা, 'বৈঠকখানা'-ধরনের বাড়ি। ওটির মালিক ছিলেন চন্দননগরের জমিদার ব্যানার্জিবাবুরা। বাড়িটির ঘেরা'র মধ্যে ছিল বিরাট বাগান আর পুকুর। আমার মনে পড়ছে,—প্রফুল্লচন্দ্র ধুতি গুটিয়ে নিয়ে কোদাল হাতে আমাদের, মানে ছোটদের সঙ্গে মাটি কোপাতে লেগে গেলেন। কোদাল চালাতে খুব ভাল পারতেন।"

প্রফুল্লচন্দ্রের অন্য 'হবি' ছিল গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করা। তা'ও পুরোদমে চলতে লাগল।

প্রায় একবছর অপেক্ষা করবার পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রকে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ীভাবে রসায়নের সহ-অধ্যাপকের পদ দেওয়া হল। বেতন মাসিক ২৫০ টাকা।

॥ প্রেসিডেন্সী কলেজ ॥

প্রেসিডেন্সী কলেজ হল আমাদের দেশের শিক্ষার জগতে অত্যন্ত গৌরবের বস্তু। ঐ কলেজের গোড়ার কথা একটু বলে নিলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় অথবা তিনি যখন শিক্ষক হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এলেন, তখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কেমন ছিল, কোন্ ঐতিহ্য তারা লাভ করেছিল, সে বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা যেতে পারে।

গল্প শুরু করা উচিত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সময় থেকে, যখন মেকলে সাহেব (Macaulay) তখনকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে এদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি কি হবে, সে বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত 'প্রতিবেদন' (Minutes) পেশ করেন। তার আগে, বেশ কিছুদিন ধরেই বাক্-বিতণ্ডা চলছিল, সরকার কি পুরনো পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী ভাষায় লেখা সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্যেই টোল-ইস্কুল-মাদ্রাসা চালিয়ে শিক্ষাখাতের টাকা খরচ করবে, না দেশের বেশ কিছু আধুনিক চিন্তাশীল পণ্ডিত লোক, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায় প্রমুখ যা চাইছিলেন, সেই ইংরেজী ভাষায় পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্কুল কলেজ খুলবে। তার আগেই কয়েকটি মিশনারী বিদ্যালয় মারফৎ এদেশের ছাত্ররা পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ পেয়েছিল। মূলতঃ সেই জন্যেই দেশের তখনকার শিক্ষিত মহলে চাহিদা হয়েছিল ইংরেজী ভাষা, ইতিহাস দর্শন এবং বিজ্ঞানেরও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের। মেকলের প্রতিবেদনের ফলে তখনকার বিদেশী সরকার মেনে নিলেন যে প্রাচীন ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতি বাতিল করে এদেশে ইউরোপীয় বা বিলেতী ধরনের স্কুল কলেজ খুলে পশ্চিমী শিক্ষাই চালু করা হবে। অবশ্য এটি মনে করলে ভুল হবে যে ১৮৩৫

খ্রীষ্টাব্দের আগে দেশে ইংরেজী-শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে দীক্ষিত লোক ছিল না। ইংরেজ শাসনের প্রায় ৯০ বছর কেটে গেছে, —আইন আদালতের কাজ চালাবার জন্যেই এদেশে ইংরেজী-শিক্ষিত লোক গড়ে নিতে হয়েছিল। প্রধানতঃ মিশনারী স্কুল কলেজের চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছিল। কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। হিন্দু কলেজের পাঠক্রমে ইংরেজী সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাও যুক্ত হোক, এ দাবী দেশের মনীষীরা, বিশেষ করে রামমোহন রায় করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ডেভিড হেয়ার। 'হিন্দু বিদ্যালয়' খোলা হয়েছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করে, আর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এরই নামকরণ করা হল 'হিন্দু কলেজ'। মেকলের পরামর্শে যখন সরকার পশ্চিমী ধরনের শিক্ষার বিস্তারেই টাকা খরচ করতে মনস্থির করলেন তখন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নতুন গভর্ণর জেনারেল হয়ে লর্ড ডালহাউসি 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' খোলবার পরিকল্পনা করলেন। তখন ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ কয়েকটি 'প্রেসিডেন্সীতে' বিভক্ত ছিল। কলকাতা (বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত), মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে মোট তিনটি তথাকথিত 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' খোলবার কথা হল। 'হিন্দু কলেজ' আর রইল না,—রইল অবশ্য 'সংস্কৃত কলেজ'। কলকাতা মাদ্রাসা (যেখানে আরবী, ফার্সী ও ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যা শেখান হত) উঠে গেল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই। সেই বছরই পত্তন হল কলকাতা 'মেডিক্যাল কলেজের'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অবশেষে, মেকলের প্রতিবেদন গ্রাহ্য হবার ৩৮ বছর পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ চালু হল।[১]

॥ আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার গোড়াপত্তন ॥

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের কাজকর্মের জন্যে প্রথম প্রথম 'দেশ' থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ আমদানী করে নিত। এদেশের

১। Hundred Years of University of Calcutta, 1957, Calcutta University.

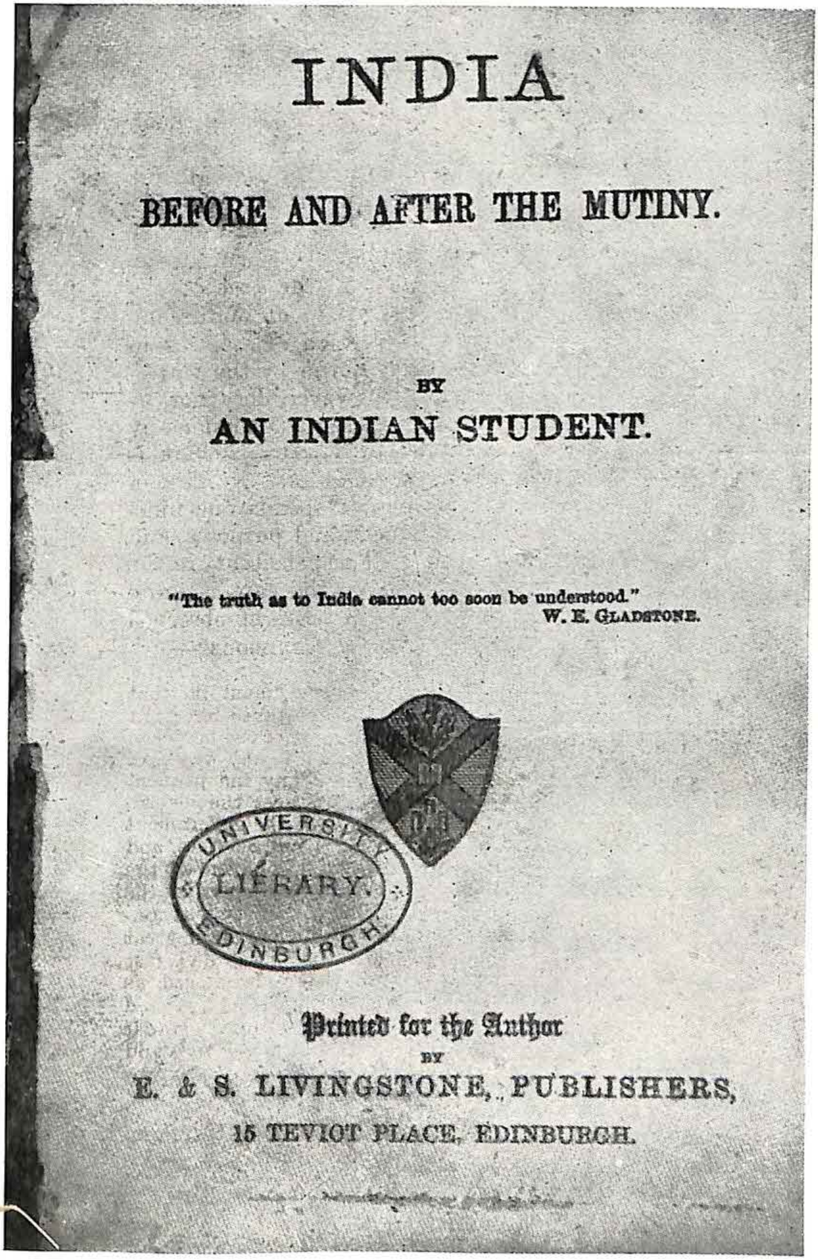
'নেটিভ'দের ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করার কোন দায় তাদের ছিল না। তবে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, গবেষণা বা তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে তারা অবশ্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান[১,২] তৈরি করল, যেমন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন', ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের 'অবজারভেটরি', ১৭৯৪-এ 'সার্ভে স্কুল', ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে', ইত্যাদি। সবই অবশ্য অধিকার করা এই দেশকে ভালভাবে জানবার ও শোষণ করবার সুবিধের জন্যে। কিন্তু এর ফলে এদেশে কাজ করবার সুবিধে পেয়েছিলেন নামকরা ইংরেজ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানিরা,—যেমন, উইলিয়ম ল্যাম্বডন, জর্জ এভারেস্ট, হেনরি ভয়েসী, প্রমুখ। এই সময়কার একমাত্র উজ্জ্বল ভারতীয় নাম যা পাওয়া যায় সেটি হল রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

আঠার শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোনসের দ্বারা 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের' প্রতিষ্ঠা। এই একটিমাত্র কাজই ছিল ভারতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে দৃঢ়তম পদক্ষেপ। Journal of Asiatic Society of Bengal নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল ভারততত্ত্ব ও বিজ্ঞান, দু'রকমের বিষয়বস্তুর ওপরে গবেষণার বৃত্তান্ত ও ফলাফল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন Indian Association for the Cultivation of Science ;

১। Acharya Prafulla Chandra Ray, Growth and Decline of a Legend ;—Santimoy Chatterjee, Science & Culture, 51, (1985), Nr. 7.

২। The Character and Introduction of Western Science in India during the Eighteenth and Nineteenth Century.—Santimoy Chatterjee, Indian Journal of History of Science, 1, (1966), 122-127.



INDIA

BEFORE AND AFTER THE MUTINY.

BY

AN INDIAN STUDENT.

"The truth as to India cannot too soon be understood."
W. E. GLADSTONE.

Printed for the Author
BY
E. & S. LIVINGSTONE, PUBLISHERS,
15 TEVIOT PLACE, EDINBURGH.

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা থেকে ছাপান India Before and After Mutiny
পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা।



জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে, প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৯০৭)।

তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সুবিধে করে নিতে হলে তা দেশের লোকের নিজেদের চেষ্টা বা শ্রমের সাহায্যেই করে নিতে হবে। দেখা গেছে, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম একশো বছরে যেকালে অঙ্ক ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় ৩৭৬টি প্রবন্ধ, প্রাণিবিদ্যায় ৫২২টি, ভূতত্ত্বে ৩১৭টি, ভূগোলবিদ্যায় ১৯৮টি, উদ্ভিদবিদ্যায় ৭২টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, সেকালে রসায়ন বিদ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ২৪টি। কারণ খুবই সহজ,—রসায়নবিদ্যার চর্চা করতে হলে গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি লাগে; তার তখন অভাব। হিন্দু কলেজের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মহেন্দ্রলাল সরকারকে রসায়ন ও পদার্থতত্ত্ব শেখবার জন্যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল। অন্য কোথাও না ছিল ল্যাবরেটরি, না উপযুক্ত শিক্ষক।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ঠিকমত রসায়নবিদ্যার পড়াশোনা শুরু হল যখন আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পেড্‌লার রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' (F.R.S.) হলেন। ঐ বছরেই প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকলেন।

দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকের কাছাকাছি সময়েও দেশে আধুনিক পদার্থতত্ত্ব ও রসায়নের হাতে কলমে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ তেমন শুরু হয় নি।

॥ প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতার প্রাথমিক পর্ব ॥

কলকাতায় বিজ্ঞানের পাঠ নেবার বা বিজ্ঞান বিষয়ে, অন্ততঃ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ফলিত বিষয়ে, গবেষণা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, একথা আমরা আগের অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দুজনেই কিন্তু এই অবস্থায় হতাশ না হয়ে অদম্য উৎসাহে উঠে পড়ে লাগলেন বিজ্ঞান পঠন-পাঠন এবং সেই সঙ্গে এদেশে মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণার ভিত্তি গড়বার কাজে।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমেই চেষ্টা করলেন নিজেকে খুব ভাল শিক্ষক

হিসেবে গড়ে তুলতে। প্রতিদিনের ক্লাসের 'লেকচার' কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তার জন্যে চিন্তা করে তিনি লেকচারের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা দেখাতেন। 'ডেমনস্ট্রেশন-লেকচার' তাঁর খুব প্রিয় ছিল। অনিবার্যভাবেই ছাত্রেরা আকৃষ্ট হল। প্রফুল্লচন্দ্রের মনে ছিল, তাঁর ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক পেড্‌লারের পড়ান, যে পড়ানর ধরন-ধারণে তিনি নিজে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ক্লাসে রসায়নের পরীক্ষা হাতে কলমে দেখাতে পেড্‌লার ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে[১] ইংরেজীতে যা লিখে গেছেন তার বাংলা করলে হয়,—"নীচু ক্লাসের ছাত্র, যারা সবে রসায়নের পড়াশোনা শুরু করেছে, তাদের কাছে ভাল অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অধ্যাপকের নিজের পরীক্ষা করবার (এক্স্‌পেরিমেণ্টের) হাতটি ভাল হতে হবে, বিশেষ করে ক্লাসে দেখাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার (ডেমনস্ট্রেশন)। পরীক্ষাগুলি এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তাঁর বক্তৃতা শুধু আকর্ষণীয় নয় বরং তা বিষয়বস্তুকেও বুঝতে সাহায্য করবে। অধ্যাপকের পক্ষেও জুনিয়ার "ক্লাস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট" (সাহায্যকারী)-এর কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।··· এম.এস.সি. অথবা থিসীস লিখে ডি.এস.সি. ডিগ্রী পাওয়া শিক্ষকও জুনিয়ার ছাত্রদের কাছে হঠাৎ লেকচার দিতে হলে অনেক সময়ে কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ান। ইউডিওমিটার নলে পারদ ভরে, তারপরে ২ আয়তন হাইড্রোজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন গ্যাস নলে পাঠিয়ে, পারদকে সরিয়ে দিয়ে, নল ভরে ফেলে, গ্যাসমিশ্রণে বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়ে বিস্ফোরণের পরে জল সৃষ্টি করবার পরীক্ষা দেখানতে তিনি হিমসিম খেয়ে যেতে পারেন। এরকম পরীক্ষা দেখানর চেষ্টা না করে ভয় পেয়ে অধ্যাপক বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন; হয়ত অ্যাপারেটাস-গুলি টেবিলে সাজিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধান করেন।তিনি অথবা বোর্ডে ছবি এঁকেই দায়িত্ব শেষ করেন।"

১। Autobiography of a Bengali Chemist—P. C. Ray, (Orient সংস্করণ, ১৯৫৮)

পেড্‌লার সাহেব ক্লাস-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসেবে শিখিয়ে পড়িয়ে সহকারী করে নিয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীকে। প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন,—"আমি বিলেত ফেরৎ, ডিগ্রীধারী, এসব অহঙ্কারকে মন থেকে দূর করে দিয়ে ভাদুড়ীর হাতেই নিজেকে সমর্পণ করলুম। কখনও বা পেড্‌লারের কাছেই নতুন করে শিখতে শুরু করলুম কিভাবে ক্লাস-লেকচারের সঙ্গে ডেমনস্ট্রেশন পরীক্ষা দেখাতে হয়। নিখুঁতভাবে তা করবার জন্যে বহুবার রিহারস্যাল দিতাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমার সমস্ত জড়তা কেটে গেল আর পরের "সেশনের" শুরুতেই এটি বুঝতে পেরে খুশি হলুম যে ছাত্রদের মোকাবিলা করবার জন্যে আমি ভাল-ভাবেই তৈরি হয়েছি।"

অবশ্য হোপ প্রাইজ পাওয়া ছাত্র হিসেবে এডিনবরাতে প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাস চালানর অভিজ্ঞতা তাঁর আগে থেকেই ছিল। তবুও ক্লাসের লেকচার তৈরি করাতে তিনি ছিলেন অসম্ভব রকমের যত্নবান। প্রতিটি লেকচার তিনি লিখে নিয়ে তৈরি করতেন।

১৮৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসের পরে পেড্‌লার ছুটি নিয়ে বিলেতে চলে গেলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের পুরো দায়িত্ব পড়ল প্রফুল্লচন্দ্রের ওপর। কাজের চাপ প্রচণ্ড বাড়ল। হয়ত বিশ্রাম ছাড়াই পরপর তিনটি ক্লাসে তিনঘণ্টা একটানা লেকচার দিতে হল। কিন্তু এতে তাঁর আনন্দই বাড়ল। তিনি প্রেসিডেন্সীতে অধ্যাপনা করেছেন ২৭ বছর। কিন্তু সবসময়েই তিনি ফার্স্ট ইয়ার ও থার্ড-ইয়ারের ক্লাস নিতেন কারণ রসায়ন পাঠে নতুন ব্রতী ছাত্রদেরই তিনি পড়াতে ভালবাসতেন। তিনি বলতেন—'ওরা হল কুমোরের চাকে চড়ান নতুন কাদামাটি, কুমোর যেমন ইচ্ছে তেমন মূর্তি ওদের দিয়ে তৈরি করতে পারে।'

তাঁর ক্লাস নেওয়ার ধরনটিও ছিল নতুন রকমের। তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (যিনি লাহোরে অধ্যাপক ও পরে ভারত সরকারের Director of Drug and Dressing হয়েছিলেন)

লিখছেন[১]—"উনি পাঠ্য বিষয়টির আদি ইতিহাস আলোচনা করতে ভালবাসতেন আর তারপরে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিস্তারিত করতেন। খুঁটিনাটির দিকে বেশি দৃষ্টি দিতেন না। মানুষের চিন্তার অগ্রগতির পথটি চিনিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এইভাবেই ছাত্রদের মনে বিচারশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা যায়। অতীতের দিকপাল বিজ্ঞানী, যেমন ডেভি, ফ্যারাডে, বার্জেলিয়াস, টমসেন, ম্যাক্স্ওয়েল, কেকুলে, ভিক্টর মেয়ার, র‍্যামজে, র‍্যালে এবং উনিশ শতকের আরও অনেক বিজ্ঞানী যাঁরা বিজ্ঞানকে গড়ে দিয়ে গেছেন, তাঁদের কাজ সম্বন্ধে এভাবেই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।"

"ক্লাস শুরু করতেন সাধারণত কোন একজন ছাত্রের সঙ্গে দু-একটি মজার কথা বলে। তারপরে ক্রমশঃ বিষয়ের গভীরে ডুব দিতেন, সঙ্গে থাকত হাতে-কলমে পরীক্ষার পর পরীক্ষার প্রদর্শন।"[২]

১। Acharya Ray and Chemical Research in Modern India, Journal of the Indian Chemical Society, Vol. 38, (1961)

২। Acharya Ray as I knew hlm,—J. N. Ray, P. C. Ray Birth Centenary Souvenir, Calcutta University (1961)

॥ প্রেসিডেন্সী কলেজে মৌলিক গবেষণার সূত্রপাত ॥

প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ল্যাবরেটরির অবস্থা ভাল ছিল না। ল্যাবরেটরি ঘরটি ছিল হেয়ার স্কুলের পুরনো বাড়িতে। রসায়নাগারের চেহারা যেমন হওয়া উচিত, অর্থাৎ যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা, ঝাঁঝাল গ্যাস বা ক্ষতিকারক বাষ্প বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা, ইত্যাদি হেয়ার স্কুলের ঐ ঘরে তার কিছুই ছিল না। এমন কি, ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করবার জায়গাও বিশেষ ছিল না।

একদিন প্রিন্সিপ্যাল চার্লস্ টনি সাহেব এলেন ল্যাবরেটরিতে। ঘরটি তখন রাসায়নিক বস্তুর ঝাঁঝাল ধোঁয়া ও বাষ্পে ভরপুর। টনি সাহেবের নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হওয়ায় উনি প্রায় ছুটেই ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার দেখে উনি খুব বিচলিত হয়ে শেষকালে সরকারী দপ্তরে লেখালেখি শুরু করলেন একটি নতুন ল্যাবরেটরি বাড়ি তৈরি করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। টনি ডি. পি. আই.-কে (শিক্ষা অধিকর্তা) জানালেন যে, ব্যাপার এরকম চলতে দিলে সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ কলেজের কর্তাদের নামে আদালতে নালিশ করবে। অবশেষে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার নতুন বাড়ি করে দিতে রাজি হলেন।

কিন্তু নতুন ল্যাবরেটরির নক্সা কি রকম হবে তার কোন ধারণা সরকারী মহলে ছিল না। দেখা গেল যে প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে এডিনবরার ল্যাবরেটরির প্ল্যান রয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে জেনেই যেন তিনি এডিনবরার ল্যাবরেটরির প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্ট (নক্সা) নিয়ে এসেছিলেন এডিনবরা ছাড়বার সময়েই। সুতরাং কাজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল আর প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করবার

পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি এডিনবরার ধাঁচের নতুন ল্যাবরেটরি পেয়ে গেলেন।

অবশ্য নতুন ল্যাবরেটরি বাড়ি তৈরি হওয়ার আগেও তিনি কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু করেছেন দেখতে পাই। এডিনবরায় তিনি অজৈব রসায়নের তত্ত্বীয় গবেষণাও করেছিলেন। সেই কাজের অনুসরণে তিনি প্রথম যে গবেষণাপত্র এখান থেকে ছাপালেন তা ছিল কপার-ম্যাগনেসিয়ম 'গ্রুপ'-এর 'বন্ধনযুক্ত' (conjugated) সালফেট যৌগ সৃষ্টির বিষয়ে।

১৮৯১-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যে গবেষণা শুরু করলেন তার কিন্তু যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। তা অবশ্য অজৈব রসায়নের তত্ত্বীয় গবেষণা নয়। তিনি দেখেছিলেন, শহরে তেল-ঘি নামে যে বস্তু বিক্রি হয় তার অনেকাংশ ভেজাল। তাঁর আরও মনে হল, ঘি বা মাখন এদেশে যা পাওয়া যায় তা যদি খাঁটিও হয় তবু তাদের খাদ্যগুণ বিদেশের বাজারে লভ্য ঐ ধরনের জিনিষের খাদ্যগুণের বিচারে নিকৃষ্ট মানের। তাঁর মনে হল, এর একটা প্রধান কারণ, হয়ত এদেশের গরু-মহিষের দুধের গুণগত মান বিদেশের দুধের মত নয়।

তিনি লিখেছেন, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গরু-মহিষের দুধ দোহাতেন, নিজে হাতে তা' থেকে মাখন তৈরি করতেন—তারপরে নিজে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতেন। নিজে নানা জায়গা থেকে সরষে বীজ সংগ্রহ করে নিজের তত্ত্বাবধানে তেল তৈরি করিয়ে—অন্য ভেজাল তেলগুলিও আলাদাভাবে সংগ্রহ করে, তাদের সবগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তাদের আনুপাতিক খাদ্যগুণ বিচার করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নালে' তাঁর পেপার প্রকাশিত হল,—"Chemical Examination of Certain Indian Foodstuff, Pt I, Oils and Fats", ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ঐ বছর, যখন নতুন ল্যাবরেটরি বাড়ি তৈরি হল, তখন তিনি আবার অজৈব রসায়নে গবেষণা করবার কথা ভাবলেন। এখন একটু

বলে নেওয়া যেতে পারে, উনিশ শতকের শেষভাগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রসায়ন-গবেষণা কোন্ স্তরে ছিল।

॥ রসায়ন চর্চার বিগত শতাব্দী ॥

প্রাচীন 'অ্যালকেমিস্ট'-দের আহরণ করা বিচিত্র জ্ঞান পার হয়ে রসায়ন বিদ্যা যখন সঠিক বিজ্ঞানের চেহারা নিল তখন তা সম্ভব হল ডালটনের (Dalton) বিস্তারিত গবেষণার ফলে। ডালটন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পারমাণবিক ভরের মাপ প্রচার করলেন। সেই হল পরমাণু-তত্ত্ব ও মাত্রিক (quantitative) রসায়নতত্ত্বের শুরু। বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের পারমাণবিক ও আণবিক ভর মাপবার বিশেষ আয়োজন চলতে লাগল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভি (Davy) প্রমাণ করলেন যে তথাকথিত 'অ্যালকালি (alkali) আসলে যৌগিক পদার্থ, দু'রকমের মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক জোড় বেঁধে তা গড়ে তুলেছে,—তার আণবিক ভর গঠনকারী পরমাণুর ভরগুলির যোগফল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ডেভি ও গে লুসাক (Gay Lussac) ক্লোরিন আবিষ্কার করলেন। আয়োডিন আবিষ্কার করলেন Courtoise, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের বিস্তারিত ইতিহাস হল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের ইতিহাস। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্বোলার (Wöhler) যখন কয়েকটি মৌলিক পদার্থ মিলিয়ে 'ইউরিয়া'-র মত তথাকথিত 'জৈব' (organic) অণু গড়তে পারলেন তখনই জান্তব বস্তু থেকে পাওয়া যায় এমন কয়েক হাজার 'জৈব' রাসায়নিক পদার্থের অণুর গঠনেরও হদিশ পাওয়ার পথ খুলে গেল। অজৈব ও 'জৈব' রসায়ন-বিদ্যা একই নিয়মের অধীন হয়ে রসায়নের মূল তত্ত্ব গঠনের উপায় হল।

যোসেফ প্রিস্ট্‌লি (Priestley) যখন প্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন (১৭৭৪) তখনকার কাল থেকে মোটামুটি ১০০ বছর কেটে গেলে মেণ্ডেলিয়েফ (Mendeleeʹf) তাঁর বিখ্যাত 'পর্যায় সারণী'

(Periodic Table) গঠন করে রসায়ন তত্ত্বে যুগান্তর নিয়ে এলেন। সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলিকে তাদের গুণাগুণের বিচারে একটি সীমাবদ্ধ ছকের মধ্যে এনে দিলেন তিনি। কেমিস্ট্রির 'মিস্ট্রি' (Mystery) স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রথম পর্যায় সারণী প্রকাশিত হল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

এর মাত্র ১২ বছর পরে গিলখ্রাইস্ট্ বৃত্তি নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

রস্কোর (Roscoe) লেখা রসায়নের পাঠ্য কেতাবে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে পর্যায়-সারণী ছাপা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তা'তে মাত্র ৭০টি মৌলের নাম রয়েছে। ২২টি তখনও অনাবিষ্কৃত। প্রফুল্লচন্দ্র পর্যায় সারণীতে অনুপস্থিত মৌলের আবিষ্কারে নিযুক্ত হলেন। তাঁর ধারণা হল, ভারতের খনি থেকে তোলা বিভিন্ন খনিজের বিশ্লেষণ করলে হয়ত অনাবিষ্কৃত মৌলের খোঁজ পাওয়া যেতে পারবে। প্রেসিডেন্সী কলেজেরই শিক্ষক মিঃ হল্যাণ্ড (পরে স্যার চার্লস্ হল্যাণ্ড নামে পরিচিত) 'জিওলজিক্যাল সার্ভে'-তেও কাজ করতেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে নতুন নতুন খনিজ পাথরের জোগান দিতে লাগলেন। বেশিদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। তবে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জটিল কাজের মূল্যবান অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে লাগল।

এরপরে এল তাঁর বিখ্যাত মৌলিক কাজ,—'মারকিউরাস নাইট্রাইটের' (mercurous nitrite) আবিষ্কার পর্ব।

॥ 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' (রসসিন্দুর) আবিষ্কার ॥

'নাইট্রাইট' হচ্ছে 'নাইট্রাস অ্যাসিড' (nitrous acid) ও ধাতুর মৌলের বিক্রিয়াজাত লবণের সাধারণ নাম। 'নাইট্রাস অ্যাসিড' (HNO_2), নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) মত বহু পরিচিত যৌগ নয়। নাইট্রাস অ্যাসিডের স্থায়িত্ব বজায় রাখা খুব মুশকিল, সহজেই এটি জারিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড অতি তীব্র অ্যাসিড,—নাইট্রিক অ্যাসিডের ধাতব লবণ, 'নাইট্রেট' (nitrate)। নাইট্রেট লবণ নাইট্রাইট-লবণের চেয়ে বেশি স্থায়ী

তাই সাধারণভাবে তারাই পরিচিত। নাইট্রাইটের গুণাগুণ বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না, সহজেই তা জারিত হয়ে যায়। কারণ নাইট্রাস অ্যাসিড নিজেই খুব সহজে জারিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড হয়। ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করবার আগেই নাইট্রাস অ্যাসিড হয়ত জারিত হয়ে নিজেই নাইট্রিক অ্যাসিডে বদলে যেতে পারে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের একদিন, প্রফুল্লচন্দ্র গ্যাস বিশ্লেষণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 'সাধারণতঃ 'ইউডিওমিটার'-নলে, পারদকে সরিয়ে দিয়ে, বিশ্লিষ্ট গ্যাস জমা হতে থাকে। প্রফুল্লচন্দ্র ইউডিওমিটারে ব্যবহার করবার পারদকে পরিশ্রুত করছিলেন। পারদকে পরিশ্রুত করবার একটি উপায় হল 'লঘু' (ডাইলিউট) নাইট্রিক অ্যাসিডে, ঠাণ্ডায়, পারদের বিন্দু ধীরে ধীরে ফেলা। লম্বা নলে রাখা অ্যাসিডে পারদ-বিন্দু নীচে নামতে নামতে পরিশ্রুত হয়ে যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র লক্ষ্য করলেন, ১৩-১৪% 'নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড' (N_2O_5) সমৃদ্ধ শীতল ও ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড যদি পারদের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাহলে পারদের ওপরে হলুদ রঙের একটি ক্ষীণ আস্তরণ পড়ে। এটি কঠিন বস্তু, কেলাসিত চেহারার যৌগ, লবণ। প্রথমে মনে হয়েছিল ওটি ক্ষারীয়। কিন্তু শক্তিশালী নাইট্রিক অ্যাসিডের মাধ্যমে ক্ষারীয় লবণ কি করে থাকতে পারে? "প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে ওটি 'মারকিউরাস'-লবণ (মারকিউরিক নয়) এবং ওটি একটি 'নাইট্রাইট' (নাইট্রেট নয়)। পদার্থটির আবিষ্কার গবেষণাকে সার্থক করেছে।"

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উনি গবেষণাপত্রটি ছাপালেন (১৮৯৬)। ঐ পেপারটিতে বর্ণিত পরীক্ষা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ধৈর্যের এবং তার সঙ্গে অগাধ রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করে দিলেন যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে ভারতে বসে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও মৌলিক গবেষণায় পশ্চিমীদের মতই সফল হতে পারে। Nature পত্রিকা এ বিষয়ে মন্তব্য করে লিখল— "এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল' সাধারণত রসায়ন-গবেষণাগারের

পাঠাগারগুলিতে রাখা হয় না। ঐ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের ডঃ পি. সি. রায়ের 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধের জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীতল, লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড ও পারদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মারকিউরাস নাইট্রেট তৈরীর প্রচেষ্টায় হলুদ রঙের কিছু কেলাসিত বস্তু অধঃনিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশেষ পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে ওটি 'মারকিউরাস নাইট্রাইট'।"

॥ **প্রেসিডেন্সী কলেজের বিপুল কর্মযজ্ঞ** ॥

এই নতুন পাওয়া রাসায়নিক বস্তুটির ধর্ম জানবার কাজ ও তার ব্যবহার বিষয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হল প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে। চেষ্টা চলল অন্য মৌলগুলির নাইট্রাইট-লবণ পাওয়া ও তাদের সাধারণ ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধানের। দীর্ঘ অনুসন্ধান। মার-কিউরাস নাইট্রাইট-লবণ তৈরি করবার বিশদ উপায় সম্বন্ধে নিবন্ধ সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হল লণ্ডনের 'জার্নাল অব দি কেমিক্যাল সোসাইটিতে' (এরপর থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা **J. C. S.** বলে উল্লেখ করব), ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। মারকিউরিক নাইট্রেটের সঙ্গে পটাশিয়ম সায়ানাইডের বিক্রিয়ায় সায়ানাইড বিজারিত হয়ে পটাশিয়ম সায়ানেট হল আর মারকিউরিক নাইট্রাইট বিজারিত হয়ে সৃষ্টি হল হাইপোনাইট্রাইট।

এরপরে প্রফুল্লচন্দ্র চেষ্টা করতে লাগলেন,—বেরিয়ম, ক্যাল-সিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি 'অ্যালকালাইন আর্থ' (ক্ষার-মৃত্তিকা) গ্রুপের মৌলের নাইট্রাইট-যৌগ তৈরি করবার। তাঁর চেষ্টায় শীঘ্রই এগুলিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করা গেল। তিনি দেখলেন যে ম্যাগনেসিয়ম নাইট্রাইট এ জাতীয় নাইট্রাইটগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী। 'মারকিউরিক' ও ক্যালসিয়ম গ্রুপের মৌলের 'ডবল নাইট্রাইট'—যেমন [$Hg(NO_2)_2$, $Ca(NO_2)_2$, $5H_2O$] প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে দেখালেন যে ঐ গ্রুপের যে মৌলটির পারমাণবিক

ভর অপেক্ষাকৃত কম, সেখানের 'ডবল-নাইট্রাইটে' মারকিউরিক নাইট্রাইটের সংযুক্তি-ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং বেরিয়ম-মারকারি-ডবল-নাইট্রাইটের ও লিথিয়ম-মারকারি-ডবল-নাইট্রাইটের সংকেত লিখলে, তা হবে—

$3Hg(NO_2)_2, 2Ba(NO_2)_2, 5H_2O$, এবং
$Hg(NO_2)_2$, $4Li(NO_2)_2$, nH_2O,— 'n' হল

যে কোনও সংখ্যা।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ধরনের ডবল-নাইট্রাইটের কাজগুলি চলেছিল ক্রমাগত। বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল J.C.S-এ এবং Proceedings of the Chemical Society পত্রিকায়।

জৈব যৌগের গ্রূপের সঙ্গে গ্রথিত ডবল-নাইট্রাইট সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা তা'ও দেখলেন। মারকারি-অ্যালকিল নাইট্রাইট ও মারকারি-অ্যারিল-অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট যৌগ সৃষ্টিতে তিনি সফল হলেন। এদের কয়েকটির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করে তার বিবরণ দিলেন তিনি।

১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি তিনি যে সব নতুন যৌগ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মিথাইল-অ্যামোনিয়ম-নাইট্রাইট, অ্যালকিল-অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট ও টেট্রামিথাইল-অ্যামোনিয়ম হাইপোনাইট্রাইট। বিশদভাবে তাদের রাসায়নিক গুণাগুণ তিনি পরীক্ষা করেছেন।

এবারে রসায়নের গবেষণার খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত সাময়িকভাবে মুলতুবী রেখে তাঁর জীবনের অন্যতম বড় দিকটি, অর্থাৎ পূর্ব-ভারতের প্রথম রসায়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রফুল্ল-চন্দ্রের আত্মপ্রকাশের কথা বলা যাক।

॥ ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ঃ পূর্বকথা ॥

ঐতিহাসিক কালের প্রথম থেকেই ভারতবর্ষ শিল্প ও বাণিজ্যে যথেষ্ট অগ্রগণ্য ছিল। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি লিখছেন,—ভারতীয় শিল্পজাত বস্তু কেনবার জন্যে রোমক সাম্রাজ্যকে বছরে দশলক্ষ মুদ্রা (sestarces) ব্যয় করতে হয়। প্লিনি দুঃখ করছেন,—এইভাবে রোম আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে আর ভারতের হচ্ছে লাভ। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি, যেমন ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ,—সকলেই ভারতবর্ষের তৈরি জিনিস কেনবার জন্যেই জাহাজ ভাসিয়ে এদেশে এসেছিল। আবহমান কাল ধরে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ বিপুল লাভ করে এসেছে। ভারতের রপ্তানীর মধ্যে ছিল সুতি ও রেশমী কাপড়, চিনি লবণ, পাট, সোরা, আফিম প্রভৃতি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাংলার সুতির কাপড় আমদানী করেছে। ওলন্দাজেরা কাশিমবাজারে তৈরি কাঁচা রেশম কিনে জাপানের বাজারে বিক্রি করেছে।

ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করায় বাংলা তথা ভারতের কপাল পুড়ল। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়বছরে ৩৮০ কোটি টাকা ইংরেজ এদেশ থেকেই আদায় করেছে আর ঐ টাকা দিয়ে এদেশেরই শিল্পজাত জিনিসপত্র আর কাঁচামাল কিনে নিজের দেশে চালান দিয়েছে। ভারতবর্ষ এর বদলে কিছুই পায় নি। 'কোম্পানীর' (ইংরেজ East India Company) দৌরাত্মে বাংলার মসলিন বা সুতিবস্ত্রের শিল্প রসাতলে গেল। রেশম শিল্পেরও সেই দশা ঘটল। বিচিত্র আইনকানুন চালু করে ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে করে তুলল কাঁচামালের সরবরাহকারক,—তৈরি কাপড় আমদানী হতে লাগল ইংলণ্ড থেকে। ১৭৯০ থেকে ১৮০০, এই দশ

বছরে ইংরেজ ভারত থেকে ১৮ কোটি পাউণ্ড লুঠ করেছে তাদের দেশ থেকে ভারতে কাপড় আমদানী করে,—যে জিনিস ভারত চিরকাল পৃথিবীর সবদেশে রপ্তানীই করে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, পলাশীর যুদ্ধের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ বদল হয়ে দেশ গরীব, পরনির্ভর হয়ে গেল। বাণিজ্যের ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হল। যেটুকু বাকি ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাল। বিদেশী সরকার বৈষম্যমূলক নানা আইন-কানুন পাস করে তার সাহায্যে এক অভাবনীয় শোষণ চালিয়ে একদা-শিল্পবাণিজ্য-সমৃদ্ধ এই দেশকে করে তুলল ইংলণ্ডের কলকারখানার কাঁচামালের জোগানদার ও ইংলণ্ডের বাঁধা বাজার।

ইংলণ্ডে বাষ্পশক্তির আবিষ্কার ও শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তার জিনিস পাশ্চাত্য দেশে প্রভূত পরিমাণে কলে তৈরি হতে লাগল। আমরা বাধ্য হলাম অনেক বেশি দামে সেই জিনিস ক্রমাগত আমদানী করতে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিলেত থেকে আমদানী করা জিনিসের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে[১]—রেশমী কাপড়, আসবাবপত্র বা ফার্নিচার, ঘড়ি, হাতঘড়ি, কাগজ, পিচবোর্ড, সুগন্ধি, স্টেশনারি জিনিসপত্র, সিগারেট, গাড়ির অংশ ও তৈরি গাড়ি, বাইসাইকেল, মোটরগাড়ি, দেশলাই, সেলাইকল, ছাতা, সাবান, কাচের বাসন, এনামেলের বাসন, হ্যারিকেন লণ্ঠন ইত্যাদি। ভারত থেকে শস্তায় যে জিনিস বিলেতে চালান যেতে লাগল তার মধ্যে রয়েছে কাঁচা পাট, চা, লাক্ষা, চামড়া ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে আমরা গরীব থেকে ক্রমাগত আরও গরীব হয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশঃ একমাত্র কৃষিই অর্থনীতির নির্ভর হয়ে দাঁড়াল।

১। P. C. Ray Birth Centenary Souvenir Vol. Calcutta University, Article No. IV. "Prafulla Chandra, Industrial Development of India." নামের প্রবন্ধ।

স্বদেশী যুগে এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। স্বদেশী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন না থেকে হয়ে উঠল অর্থনৈতিক আন্দোলনও। পলাশীর যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষ সুতি কাপড়ের প্রধান রপ্তানীকারক ছিল। তাই স্বদেশী আমলে প্রথম প্রচেষ্টা হল সুতি কাপড়ের কল গড়ে তোলার। বোম্বাই প্রদেশে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি কাপড়ের কল বসেছিল, এখন স্বদেশী আমলে বাংলায় এই প্রচেষ্টা শুরু হল।

বোম্বাই প্রদেশে ও নাগপুর, শোলাপুর, আমেদাবাদে প্রথম দিকের গড়ে তোলা সুতিকলগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৯০৫-এর পরে বাংলায় দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যখন জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল।

বিদেশী শিল্পকলা-কৌশল শেখবার জন্যে স্বদেশী ছাত্রদের বিদেশ যাওয়ার দরকার হয়েছিল। বাংলায় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ নিজের টাকায় স্বদেশী ছেলেদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এ কাজে সাহায্য করলেন ইংরেজ বন্ধু স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। তিনি ছিলেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন' (BISN) নামের জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নির্দেশে এই কোম্পানীর জাহাজে বিনা ভাড়ায় শিল্পশিক্ষার্থী ছাত্ররা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেল। এমন অনেক কৃতি ছাত্রের নাম করা যায় যাঁরা পরে দেশে ফিরে এসে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র দাশ ও আর. এন. সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী', অনাথ-বন্ধু সরকার,—'বেঙ্গল ক্যানিং ইণ্ডাস্ট্রি', এস. এম. বসু—'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ', ইত্যাদি। যোগেন বসু, এস. সি. রায়, পি. সি. রায়, রসিকলাল ঘোষ, অনেকেরই নাম করা যায় যাঁরা কোনও না কোন বিশেষ বিষয় শিখে এসেছিলেন।

এই আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী আমলে, ১৯০৫-এর পরে।

এর আগেই প্রফুল্লচন্দ্র নেমে পড়েছিলেন স্বদেশী চেষ্টায় রাসায়নিক ও ওষুধ তৈরির কারখানা স্থাপনের কাজে।

॥ বেঙ্গল কেমিক্যালের সূচনাপর্ব ॥

একটা কথা প্রচলিত ছিল,—যে দেশ যত বেশি সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে, সে দেশ তত বেশি সভ্য। প্রফুল্লচন্দ্র এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিডটি স্বদেশে বৃহৎ পরিমাণে তৈরির পরিকল্পনা গোড়াতেই নিয়েছিলেন। দেশের বেকার যুবকেরা চাকরির আশায় বসে না থেকে শিল্প-বাণিজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের এটাই হল মূল বক্তব্য। তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করবার কাজে নামলেন।

সে সময়ে কাশীপুরে D. Waldie নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান ঐ অ্যাসিডটি অল্প পরিমাণে তৈরি করত। আরও দু' একটি কারখানাও এই কাজ করত। সবশুদ্ধ দৈনিক আধ টনের মত সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যেত। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি দেশী পদ্ধতিতে মাটির জালায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডও তৈরি করত। সে সময়ে অ্যাসিড আমদানী করতে হলে জাহাজ ভাড়া খুব বেশি পড়ে যেত। তাই এসব দেশী কোম্পানী-গুলি মোটামুটি লাভই করত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাড়ুলির এক উকিল ভদ্রলোক, যাদবচন্দ্র মিত্র, ছোট একটি অ্যাসিড তৈরির কারখানা আসগর মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে কেনেন। তিনি প্রফুল্ল-চন্দ্রকে বললেন, কারখানাটি যেন একবার তিনি দেখে যান। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র গেলেন দেখতে। ফ্যাক্টরিটিতে ১০´× ১০´ ও ৭´ উঁচু দুটি 'সীসাকক্ষ' (Lead chamber) ছিল। 'চেম্বার পদ্ধতি'তে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হত। এই পদ্ধতি পুরনো,—এতে প্রথমে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়; ঐটির সাহায্যে সালফার ডাইঅক্সাইডকে জারিত করে সবশেষের প্রাপ্তবস্তু হিসেবে পাওয়া যায় সালফিউরিক অ্যাসিড। প্রফুল্লচন্দ্র

দেখলেন যে কারখানাটির অবস্থা বেশ খারাপ। নাইট্রিক অ্যাসিডের বিষাক্ত ধোঁয়াকে জলে শোষিত করে ফেলার ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ দূষিত। প্রফুল্লচন্দ্র স্থির করলেন, সত্যিকারের আধুনিক কারখানা গ'ড়ে উন্নত পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশ্য এই সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা দেখতে আসার আগেই প্রফুল্লচন্দ্র কিছু কিছু ওষুধ ও অন্য রসায়ন তৈরি করে ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে তিনি থাকতেন। বাড়িটি বর্তমান সায়েন্স কলেজের বিশাল বিস্তারের ঠিক দক্ষিণে। ঐ বাড়িতেই তিনি নানা রাসায়নিক জিনিস-পত্র তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। ব্যবসায়ে নামবার আগে তিনি আধুনিক ধরনের 'মার্কেট-রিসার্চ' (বাজারচাহিদা নিরূপণ) করে নিয়েছিলেন।[১] বাজারে কোন্ ওষুধ বেশি চলছে, কোন্‌টি বা বেশি পরিমাণে আমদানী করতে হয়, এ সবের খোঁজই তিনি নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে নজর ছিল কাঁচামালের সহজলভ্যতার দিকেও। এদেশে আমদানী করা ওষুধ নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা ছিল তাঁর প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরিতে। সুতরাং নিজের তৈরি ওষুধেরও গুণগত মান ক্রমাগত পরীক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজও বটে, অবশ্যকর্তব্য হিসেবে তা চালিয়েও গেলেন তিনি। ক্যালসিয়ম সুপার ফস্‌ফেট একটি বিশিষ্ট রসায়ন। তিনি সর্ব-প্রথমে ঐ জিনিসটি তৈরি শুরু করলেন। কাছাকাছি (রাজাবাজার অঞ্চলে) কসাইখানা থেকে হাড় সংগ্রহ করা হল। বসতবাড়ির ছাদে শুকান হতে লাগল সেই হাড় (প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধের জন্যে নিশ্চয়ই খুব আপত্তি জানিয়েছিল)। উদ্দেশ্য,—হাড় পুড়িয়ে (calcination

---

১। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ সেন সম্পাদিত Acharya Prafulla Chandra Ray ; Some Aspects of his life and Work নামের পুস্তক (Indian Science News Service প্রকাশিত), ১৯৮৬।

বা ভস্মীকরণ) সেই ভস্মকে সালফিউরিক অ্যাসিডে জারিত করে ও সোডিয়ম কার্বনেটের সাহায্যে ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট ও সোডিয়ম ফসফেট পাওয়া। এই পদ্ধতিতে ঐ দুটি রসায়নই তরল অবস্থা থেকে শেষে কেলাসিত কঠিন অধঃক্ষেপ হিসেবে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেল। পরে অন্য কয়েকটি ওষুধ যেমন, সিরাপ-ফেরি-আয়োডাইড, লাইকার-বিস্‌মাথ, লাইকার-আর্সেনিক্যালিস, স্পিরিট, ইথার নাই-ট্রোসাই ইত্যাদি তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন। শান্তা দেবী লিখছেন[১] : "দু-একজন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে ঔষধ, সিরাপ প্রভৃতি তৈয়ারি তিনি শুরু করলেন। সে সময়ে বিক্রিওয়ালাদের কাছ থেকে পুরনো বোতল কিনে কাজ চালাতেন।" ব্যবসাটির নামকরণে : 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,' এই নামটি গোড়া থেকেই তিনি ব্যবহার করেন।

"কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও তৈরি জিনিস বাজারে চালানর জন্যে দালাল নিযুক্ত হল। কিন্তু (ওষুধের) ব্যবসাদাররা "বিলেতী" মাল ছেড়ে দিশি মাল কিনতে রাজি নয়। লোকে যে চায় না—দিশী মালের চেহারা ক্রমেই যথাসম্ভব সুন্দর করার চেষ্টাও হল এবং ধীরে ধীরে দোকানে তা একটু স্থান পেল।"

প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টা হল 'ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায়' নির্দিষ্ট ওষুধ-গুলিরই কয়েকটি তৈরি করবার। অবশ্য তাঁর কোম্পানীর প্রথম যে 'অর্ডার' পাওয়া গেল, তা হল কয়েক ডজন বোতল সিরাপ সরবরাহ করবার (১৮৯১)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখছেন,—গ্রাম থেকে আসা তাঁর ভাই-এর ওপরে হুকুম হল, চীনাপটি থেকে একবস্তা চিনি কিনে আনবার। বলে দেওয়া হল,—যাবার সময়ে ট্রামে চড়ে যাবে, ফিরবে মুটের মাথায় বস্তা চাপিয়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে। দোকানদার, খরিদ্দার, কারোরই তখন দেশী ওষুধের ওপরে বিশ্বাস নেই।

১। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র: শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ; (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।

ডাক্তাররাও প্রেসক্রিপ্‌সনে দেশী ওষুধের নাম লেখেন না। এমন অবস্থায়, যখন লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে আর্থিক মূলধনের সত্যিই অভাব (বস্তুতঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল শুরু হয়েছিল ৮০০ টাকা মূলধন করে); তখন ডাক্তার কার্তিক বসু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি নামকরা ডাক্তার; তখনকার সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান "বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং"-এ তিনি বসতেন। কার্তিক বসু বটকৃষ্ণ পালের দোকানে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ রাখতে লাগলেন, প্রেসক্রিপসনে লিখতে লাগলেন। দেশী ওষুধে কাজ হ'চ্ছে, সুতরাং চাহিদা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে এসময়ে বিচারপতি রানাডের পরামর্শে অধ্যাপক গজ্জার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অ্যালেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌'-এর। বরোদার গায়কোয়াড়ের অপরিমিত অর্থসাহায্য অ্যালেম্বিকের পেছনে থাকায় মূলধনের জন্যে তাদের কখনও ভাবতে হয়নি। বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ে টাকা খাটানর বদলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নেওয়ার জন্যে জমিদারী কিনতে ব্যস্ত! হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন,—আচার্যদেব গল্প করেছিলেন, একবার এক শেয়ার হোল্ডার তাঁর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড দশ আনা পয়সা নিতে এলে কোম্পানীর ভাঁড়ার সেদিন এমনই শূন্য যে সেদিন দরোয়ানের কাছ থেকে সেই দশ আনা ধার করে তবে ডিভিডেণ্ড মিটিয়ে দিতে হয়েছিল।

ইংরেজী ১৮৯০ সালে রসায়নে এম. এ. পাশ করলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। ১৮৯২ সালে তিনি আচার্যের বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন। বস্তুতঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী হিসেবে কাজ শুরু করে ১৮৯২ সালেই। সতীশচন্দ্রের উৎসাহ ছিল প্রচুর। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে পেয়ে খুশি হলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মোদ্যম বেড়ে গেল। সতীশচন্দ্রের কুটুম্ব ছিলেন ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু। তিনি আবার ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রেরই বন্ধু ও সহপাঠী। মনে হয় অমূল্যচরণের পরামর্শেই সতীশচন্দ্র ওকালতি করতে না ঢুকে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন। ডাক্তার অমুল্যচরণের চেষ্টাতেই তাঁর অন্যান্য ডাক্তার

বন্ধুরা, যেমন রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এঁরা বেঙ্গল কেমিক্যালের শুভপ্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হলেন আর তাদের তৈরি দেশী ওষুধের প্রচলনে সাহায্য করতে লাগলেন। অমূল্যচরণের পরামর্শমতই আর একটি বড় কাজ হাতে নিল বেঙ্গল কেমিক্যাল। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ 'ফার্মাকোপিয়ার' নির্দেশমত ওষুধ তৈরিতেই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন থেকে দেশী গাছগাছড়া হতে পাওয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্মত নানা রকমের ওষুধ তৈরি শুরু হল। দুটি ওষুধ, বাসকের সিরাপ আর যোয়ানের আরকের (Syrup Adhatoda Vasika ও Aqua Ptychotis) বাজারে খুবই নাম হল।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই সালফিউরিক অ্যাসিডের কথায় ফিরে যাই। তাঁর গ্রামের যাদবচন্দ্র মিত্র ছোট দেশী সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানাটি কিনেছিলেন। তিনি অল্পদিন পরেই ঠিকমত তা চালাতে না পেরে প্রফুল্লচন্দ্রকে সেটি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিতে বললেন। তিনি দাম চাইলেন ১০০০ টাকা। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে একেবারেই টাকা নেই। তিন বছর প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকরি করে যে ৮০০ টাকা তিনি জমিয়েছিলেন, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাথমিক মূলধন হিসেবে তা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র দমবার পাত্র নন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসেবে তাঁর ৮০০ টাকা পাওয়ার কথা। তিনি স্থির করলেন, ঐ টাকার 'হ্যাণ্ডনোট' কেটে দেবেন তিনি আর বাকি টাকা 'ইনস্টলমেণ্টে' (খেপে খেপে) শোধ করবেন। ঐ চুক্তিতেই সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা তাঁর হাতে এল। কারখানাটি চালাবার দায়িত্ব পড়ল চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও তাঁর ভাই কুলভূষণ ভাদুড়ীর ওপরে। কারখানাটি ছিল সোদপুরে।

ইতিমধ্যে তাঁর আপার সার্কুলার রোডের 'কারখানাতে'ও কাজ বেড়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি ওষুধের জন্যে ক্রমশঃ বেশি বেশি অর্ডার আসছে। এখানে তাঁর প্রধান সহায় সতীশচন্দ্র সিংহ। সতীশের অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা! কিন্তু এই সময়েই ঘটল এক নিদারুণ

দুর্ঘটনা। একটি বিকারে (beaker) করে কিছু আগেই পটাসিয়ম সায়ানাইডের গুঁড়ো কোন যৌগ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাল করে বিকারটি ধোয়া হয়নি। সতীশ অসাবধানে সেই বিকারে করে জল গড়িয়ে খেলেন। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটল। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রফুল্লচন্দ্র ও অমূল্যচরণ নিদারুণ মানসিক আঘাত পেলেন। সতীশ ছিলেন সর্বতোভাবে প্রফুল্লচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত। এতবড় দুর্ঘটনাতেও প্রফুল্লচন্দ্র নিরুদ্যম হলেন না। আরও বেশি করে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধের অর্ডার যথেষ্ট বেড়ে যেতে লাগল।

আরও একবছর পরে, ১৮৯৪ সালে, বেঙ্গল কেমিক্যালের মূলধন দাঁড়াল তিন হাজার টাকার মত। ইতিমধ্যে সোদপুরের সেই কারখানাটি লাভ করতে না পারায় তার যন্ত্রপাতি পুরনো লোহা-লক্কড়ের দরে বেচে দিতে হয়েছে। ১৮৯৮ সালে কোম্পানীর প্রচণ্ড ক্ষতি হল যখন অমূল্যচরণও মারা গেলেন। প্রফুল্লচন্দ্র একেবারেই একা হয়ে পড়লেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল চালাতে হলে আরও মূলধন দরকার। ১৯০১ সালে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালকে 'পাবলিক লিমিটেড' কোম্পানী করে দিলেন। কোম্পানীর অংশীদার রইলেন প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, বটকৃষ্ণ পাল অ্যাণ্ড কোং-এর সত্বাধিকারী শ্রীভূতনাথ পাল, ডাক্তার কার্তিক বোস, ডাক্তার চারুচন্দ্র বসু, অমূল্যচরণ ও সতীশ সিংহের বিধবা পত্নীদ্বয়। ডাক্তার কার্তিক বোস হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ভূতনাথ পালের সঙ্গে একত্রে রইলেন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট। ১৯১০ সালে ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবস্থা বন্ধ হলে কার্তিক বোস কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ১৯০৩ সালে রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি নিলেন আর অল্পকালের মধ্যেই এর ম্যানেজার হলেন। রাজশেখর আজীবন, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য ছিলেন, ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নেন ১৯৩৩-এ।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লিমিটেড কোম্পানী হওয়ার পরে একবছরের

মধ্যে কোম্পানীর মূলধন দাঁড়াল ২৩৫০০ টাকা—মোট বিক্রির পরিমাণ ২৫২৩১ টাকা। ১৯১৫ সালে বিক্রির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা, ১৯২৬-২৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ২৫ লক্ষ টাকায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও ১৯৬৩-৬৪ সালে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। এই সময়ে মোট মূলধন ছিল ৮০ লক্ষ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যালের উত্থান, উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি, বাঙালীর কর্মোদ্যম ও ব্যবসায়-সাফল্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। সেই বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্রমাবনতি ও শেষ দৈন্যদশায় 'রুগ্ন শিল্পে' পরিণত হওয়ার ইতিহাস বেদনাময়।

তাঁর নিজের সৃষ্টি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে পরে প্রফুল্লচন্দ্রকে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। কোম্পানীর অদূরদর্শী কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর পরিচালক সভার মতবিরোধ ঘটেছিল। তার তিক্ত বিবরণ পরে দেওয়া যাবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল আজও আছে; কিন্তু তা সরকারী অধিগ্রহণে।

॥ প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চা সম্বন্ধে গবেষণা ঃ History of Hindu Chemistry ॥

বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ বার্তেলো (Marcelin Pierre Eugène Berthelot) প্রাচীন কিমিয়াবিদ্যার ইতিহাস বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন (L'Alchemiste Grecs)। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে বইটি পেয়ে প্রফুল্লচন্দ্র পড়ে ফেললেন। বইটির তিনটি খণ্ড ; সিরীয়, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যযুগের কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রসায়নচর্চার ইতিহাস ছিল তা'তে। অ্যালকেমির ইতিহাসই রসায়নতত্ত্বের আদি ইতিহাস। আদি ও মধ্যযুগের তথাকথিত অ্যাল্‌কেমিস্টদের পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আহরিত জ্ঞানই ক্রমশঃ বিধিবদ্ধ রাসায়নিক বিদ্যায় উত্তরিত হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের মনে হল, বার্তেলোর রচনা অসম্পূর্ণ। গ্রীকরা (তাদের কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্য) কিমিয়াতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছিল প্রাচীন মিশর থেকে। বস্তুতঃ 'অ্যালকেমি' কথাটিই এসেছে Khemi (মিশর দেশের প্রাচীন নাম) কথা থেকে। শুধু তাই নয়, গ্রীসদেশের রসায়ন-চর্চার ইতিহাসের বর্ণনার আগে ভারতবর্ষের প্রাচীন রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। প্রফুল্লচন্দ্র বার্তেলোকে চিঠি লিখলেন। চিঠিপত্রের মারফৎ একটি জিনিস বিশেষভাবে বোঝা গেল যে, ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস একেবারেই অজানা। তিনি সংকল্প করলেন, হিন্দুদের অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়দের রসায়ন-চর্চার ইতিহাস বিষয়ে তিনি গবেষণা করবেন আর বই লিখবেন।

এভাবেই গবেষণার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেই দিগন্তপথের প্রথম যাত্রী হলেন। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও ইতিহাসের একনিষ্ঠ সাধক। ১৮৯৬ পর্যন্ত অর্থাৎ

প্রেসিডেন্সী কলেজের নতুন ল্যাবরেটরি না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন শিক্ষকতার কাজে। এখন তাঁর কিছুটা সময় হল। তিনি পড়াশোনা শুরু করলেন হিন্দুদের প্রাচীন রসায়ন-জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ খুঁজতে। উদয়চাঁদ দত্তের লেখা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Materia Medica of the Hindus নামের বইটি তিনি পড়ে ফেললেন। এটিতে আয়ুর্বেদে বর্ণিত বিভিন্ন ওষুধ তৈরির কাজে হিন্দুরা কিভাবে বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন ক্রিয়া সমাধা করতেন, সেই বিষয়গুলি ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর History of Hindu Chemistry-র মুখবন্ধে লিখছেন, "প্রাচীন জাতিসমূহের রসায়ন বিদ্যার জ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস আমাকে বরাবরই গভীরভাবে আকৃষ্ট করত। এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে স্বভাবতই পৃথিবীর রসায়ন-চর্চার ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল ছিলই। এই জানবার কৌতূহল মেটাতেই আমি খোঁজ শুরু করলাম। চরক, সুশ্রুত প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয়দের সেই সব রচনা, কালের হস্তক্ষেপে যা এখনও অবলুপ্ত হয় নি, বিশেষভাবে সেগুলি পাঠ ও অনুধাবনের জন্যে।"

প্রফুল্লচন্দ্র বার্তেলোকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, বার্তেলো তার জবাবে লিখলেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রসায়নবিদ্যা বিষয়ের পুঁথিপত্র পেলে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে। প্রফুল্লচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে বার্তেলোকে ভারতীয় কিমিয়াবিদ্যার ওপরে লেখা পুঁথি, 'রসেন্দ্রসার সংগ্রহ' তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তেলো এই পুঁথিটির বিশদ সমালোচনা ছাপলেন; প্রফুল্লচন্দ্রের কাজ সম্বন্ধেও তাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল। Journal of Savants নামের পত্রিকায় দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধেও বার্তেলো প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশস্তি গাইলেন।

বার্তেলো ছিলেন প্যারিসের College de France-এর Organic Chemistry বা জৈব রসায়ন তত্ত্বের প্রথম নিযুক্ত অধ্যাপক। বিস্ফোরক বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের জন্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে ফরাসী দেশের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের প্রধান করা হয়। ১৮৯৫-৯৬

খ্রীষ্টাব্দে তিনি হন ফরাসী দেশের বিদেশ-সচিব। অসাধারণ রসায়ন-জ্ঞান ছিল তাঁর। তিনিই বলেছিলেন, রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপশক্তি নির্গত হবে। ছাত্রমহলে সকলেই জানে যে বার্তেলো লীন-তাপ মাপবার যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। জৈব রসায়নে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। অ্যালকোহল, মিথেন, কর্পূর, অ্যাসিটিলিন—এগুলির সবকটির সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়া বার্তেলোর নির্ধারিত। তাঁর মত অগ্রগণ্য রসায়নবিদ্ ও রসায়নের ইতিহাসবেত্তার প্রশংসায় প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন। এর পরেই তিনি স্থির সংকল্প নিয়ে শুরু করলেন ভারতীয় রসায়নচর্চার ইতিহাস রচনার কাজ।

তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে প্রাচীন পুঁথিপত্র; সেই সব পুরনো সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের কাজে তিনি সাহায্য পেলেন পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণের। স্যার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার ইতিমধ্যে ডি. পি. আই. (শিক্ষা অধিকর্তা) হয়ে এসেছেন। তিনি সরকারী সাহায্য জোগাড় করে দিলেন। নবকান্ত কবিভূষণ নানা জায়গা থেকে পুঁথি সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রথমত বারানসী থেকে কিছু সংগ্রহ করলেন তিনি। পুনার 'ডেকান কলেজে' কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া গেল। প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশের গ্রন্থাগারে চিঠি লিখে তাঁদের কাছে রক্ষিত পুঁথির খবর জোগাড় করতে লাগলেন। বিশেষ করে বিলেতের 'ইণ্ডিয়া অফিস' লাইব্রেরিতে বহু পুঁথির খোঁজ পাওয়া গেল। পুঁথি সংগ্রহ হল নেপাল থেকেও।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'History of Hindu Chemistry'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল 'বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস' থেকে। বৃহৎ পুস্তক, এটিতে ছ'টি অধ্যায়,—চরক ও সুশ্রুত শাস্ত্রে রসায়ন বিষয়ক জ্ঞান, ভাগবতে রসায়নের কথা, মধ্যযুগে (৮০০—১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) রসায়ন চর্চা, তান্ত্রিক যুগে (১১০০—১৩০০) রসায়ন চর্চা, ১৩০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে 'রসার্ণবে' বিধৃত রসায়ন জ্ঞান, 'রসরত্ন সমুচ্চয়ে' অনুরূপ রসায়ন চর্চার বিবরণ। ধাতু ও ধাতু-নিষ্কাশন, বারুদ ও সোরা প্রস্তুতির প্রাচীন প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা ছিল। প্রথম সংস্করণের

মুখবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, (অনুবাদ,—লেখক)—"স্যার উইলিয়ম জোন্সের সময় থেকেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় গবেষকরা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিভাগেরই চর্চা করে আসছেন। তাঁদের কাজের ফলে আমরা হিন্দুদের দর্শন ও গণিতচর্চার বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ইত্যাদি। এমন কি প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যাও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু একটি বিষয়, রসায়নবিদ্যা, দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বাস্তবিক মনে হয় এর জটিল ও দুরূহ প্রায়োগিক চরিত্র গবেষকদের নিরুৎসাহিত করেছে।"

এই বইটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র দেশে এবং বিদেশে পণ্ডিত-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। Journal of the Savants নামের পত্রিকায় বার্তেলা একটি পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা ছাপালেন। Nature, American Chemical Journal, Knowledge ইত্যাদি পত্রিকাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল বইটির। বইটি বিদেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে প্রচুর বিক্রিও হল। দেশ বিদেশের গ্রন্থকাররা এই বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন। বোহেমিয়ার (তৎকালীন পৃথক অঞ্চল) অধ্যাপক Batek লিখলেন—"I am publishing in my mother tongue in short lectures the history of natural sciences and I pray you to allow me to publish also a short extract of your excellent book —A History of Hindu Chemistry—in this connection." ; অর্থাৎ (অনুবাদ)—"আমি আমার মাতৃভাষায় ছোট ছোট বক্তৃতার আকারে ভৌতবিজ্ঞানের ইতিহাস লিখছি। আপনার অপূর্ব রচনা, A History of Hindu Chemistry পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার আমার বই-এর অন্তর্ভুক্ত করবার অনুমতি চাইছি।"

বিখ্যাত রসায়নবিদ Arrhenius-রচিত Chemistry in Modern Life নামের বইতে Hindu Chemistry থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে। তিনি স্বীকার করেছেন, ধাতুযোগ, বিশেষতঃ

পারদমিশ্রযোগে ভেষজ তৈরি হিন্দুরাই প্রথম করেছিল। এদেশে, Calcutta Journal of Medicine-এ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার লিখলেন, (অনুবাদ)—"ভারতীয়দের সম্বন্ধে কুখ্যাতি ছিল যে তারা অত্যুক্তি পছন্দ করে। এটা কালের পরিবর্তনেরই চিহ্ন যে আজ তারা পূর্বপুরুষের প্রাচীন কীর্তির ইতিহাসের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছে—তাদের সভ্যতা, কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। ক্রমাগত হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন আছে, তবেই জাতীয় পার্থিব সম্পদ ও জাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হতে পারে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত অতিশয় দক্ষ ও উৎসাহী রসায়নবিদকে পাওয়ায় আমরা আনন্দিত";—ইত্যাদি।

History of Hindu Chemistry'-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধানতঃ বৌদ্ধযুগের কিমিয়াবিদ্যাচর্চা বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩৫০-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং নাগার্জুন সম্বন্ধে আলোচনা, সেই সঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রণীত প্রাচীন ভারতীয়দের ভৌত-রসায়ন তত্ত্ব বিষয়ে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ গ্রন্থটিকে মূল্যবান করেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই ফরাসীদেশে বার্তেলোর মৃত্যু হয়েছে। এই খণ্ডটি তাঁর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। বইটির ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন,—"The Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities may yet look forward to a still glorious future, and, if the perusal of these pages will have the effect of stimulating my countrymen to strive to regain their old position in the intellectual hierarchy of nations, I shall not have laboured in vain." অনুবাদ—"হিন্দু জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে, রয়েছে বর্তমানের বিরাট সম্ভাবনা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও সে করতে পারে। যদি এই পুস্তকটি আমার দেশবাসীকে জগতের বিভিন্ন

জাতির বুদ্ধিজীবী মহলে নিজেদের পুরাতন প্রাধান্য ফিরে পাবার কাজে উদ্দীপিত করতে পারে তবে আমি মনে করব যে আমার পরিশ্রম বৃথা যায় নি।"

প্রায় পনেরো বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের লুপ্তোদ্ধার করতে। কাজটিকে প্রথম শ্রেণীর গবেষণার পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। বইটির দু'টি খণ্ডেরই যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। ওটি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ল। প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধানের বহু পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় (প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম ছাত্র) ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে ওটি আবার প্রকাশ করেন, নিজের সম্পাদনা ও পরিমার্জনায়, History of Chemistry in Ancient and Midaeval India নামে।

॥ নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইট যৌগ বিষয়ে গবেষণার বিবরণ ॥

মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে প্রায় পনেরো বছর যাবৎ নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইট শ্রেণীর বিভিন্ন যৌগ তৈরি করা ও সেগুলির রাসায়নিক ধর্ম বিচার করাই প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম প্রধান গবেষণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়-কালের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল বিলেতের Journal of Chemical Society পত্রিকায়, বা কদাচিৎ Proceeding of Chemical Society'-তে। কখনও বা তিনি ছাপাতেন Journal of the Asiatic Society পত্রিকাতেও।

হাইপোনাইট্রাইট হচ্ছে 'হাইপোনাইট্রাস অ্যাসিডের,'—(HNO_2)' এর লবণ। আগেই বলেছি (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি 'মারকিউরিক হাইপোনাইট্রাইট' তৈরি করবার সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। মারকিউরিক নাইট্রাইট আর পটাসিয়ম সায়ানাইডের বিক্রিয়ায় 'নাইট্রাইট' লবণ বিজারিত হয়ে 'হাইপোনাইট্রাইট' তৈরি হয়েছিল।

১৯১১-১৯১৩ মধ্যে মিথাইল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট, টেট্রা-মিথাইল অ্যামোনিয়ম হাইপো নাইট্রাইট, অ্যালকিল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট —এইসব যৌগগুলির সহজসাধ্য প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা ও তাদের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ধারণ করা হল।

ধাতব 'নাইট্রাইট'-লবণ তৈরির সাধারণ উপায়ের একটি হচ্ছে ঐ ধাতুর ক্লোরাইডের ও সিলভার (বা বেরিয়ম)—'নাইট্রাইটের' দ্বি-বিযোজন-বিক্রিয়া (double decomposition); যেমন: $R.Cl_2 + 2AgNO_2 \rightarrow R.(NO_2)_2 + 2AgCl_2$; ('R' হচ্ছে ধাতুটির সংকেত)। উপায়টি কাজে লাগিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র উৎপাদন করতে পারলেন—'অ্যালকিল-অ্যাম্মাইনো-হাইড্রোক্লোরাইড' এবং সিলভার নাইট্রাইট লবণের যৌথ বিক্রিয়ার (double-decomposition) ফলে 'অ্যালকিল-অ্যামোনিয়ম'-গোষ্ঠির বিচিত্র নাইট্রাইট-লবণ। এই শ্রেণীর কাজগুলি তিনি করেছিলেন, তাঁর ছাত্র (পরে অধ্যাপক) বিমানবিহারী দে'র সঙ্গে। ঐ সাধারণ উপায়টির প্রাথমিক উদ্ভাবনা প্রফুল্লচন্দ্রের।

নীলরতন ধর হলেন প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতনের সঙ্গে একত্রে অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইটের নানা ধর্ম বিচার করে তিনি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন। এই যৌগটি অন্যান্য নাইট্রাইটের তুলনায় কিছুটা বিশিষ্ট ধরনের। এটি সাদা, জলাকর্ষী, —পরে এটি 'প্ল্যাটিনাম-ছড়ান' (Platinised) অ্যাস্‌বেসটস্‌-এর ওপরে অ্যামোনিয়া চালনা করে সহজেই তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে এটি সাদা সাদা, দীর্ঘ ও ক্ষীণ সূচী-আকারের কেলাসিত চেহারায় পাওয়া যায়। এই যৌগটি খুব একটা সুস্থিত যৌগ নয়। নীলরতন ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করলেন যে সুস্থিত (stable) না হলেও ৮০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় এর অণুগুলি বিশ্লিষ্ট না হয়ে সরাসরি ঊর্ধ্বপাতিত হয়।

অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন অন্য

বিজ্ঞানীরা,—বিশেষ করে তার বিশ্লিষ্ট হওয়ার ঘটনা (decomposition) বোঝবার জন্যে (Arndt ও Blanchard, ১৯০২)। কিন্তু ঊর্ধ্বপাতিত অবস্থায় অবিশ্লিষ্ট, সুস্থিত অণু পৃথক করার ব্যাপারটি অভিনব। এ বিষয়ে বিলেতের Nature পত্রিকা লিখেছে, (১৩ই আগস্ট, ১৯১২),—'এই উদ্বায়ী, স্বতঃই পলাতক যৌগটিকে তৈরি করা ও তার বাষ্পীয় ঘনত্ব নির্ণয় করা অধ্যাপক রায়ের অন্যতম কৃতিত্ব।' এ বিষয়ের পেপারটি তিনি পাঠ করেন লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটিতে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে (যিনি হিলিয়ম, নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি যোজকত্বহীন, স্বল্পলভ্য, পারমাণবিক গ্যাস আবিষ্কার করেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কাজটিতে যে ছাত্রেরা তাঁকে সাহায্য করেন তাঁরা হলেন নীলরতন ধর ও তিনকড়ি দে। নীলরতন ধর লিখছেন—"I gratefully remember the long period he spent with me in the laboratory and discussed the results when I was making the experiments on conductivity measurements of simple and complex nitrite solutions utilizing the electric conductivity of water. Before he proceeded to Europe for the third time in 1912, we carried on experiments by the Hoffman method on the vapour density determination of the extremely unstable substance, ammonium nitrite in vacuum. The material readily breaks up into nitrogen gas and water at the ordinary temperature with evolution of heat ($NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O + 718$ kCals).

॥ ১৯০১—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ ॥

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের আলাপ ও পরিচয় হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী,—এঁদের সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিল। বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গোপালকৃষ্ণ গোখলের। গোখলে তখন এদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। তাঁর 'সারভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির' দেশসেবার কর্মসূচী প্রফুল্লচন্দ্রকেও মুগ্ধ করে। অচিরেই দুজনের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্য দাঁড়িয়ে গেল।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে এলেন। গোখলের সঙ্গে তিনি ভারতের রাজধানী কলকাতায় এসে গোখলেরই অতিথি হিসেবে কিছুদিন রইলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন গোখলে। প্রথম থেকেই দুজনে বন্ধুত্বের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। দুজনের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে, দেশ ও সমাজ বিষয়ে ধ্যান ধারণায় আশ্চর্য রকমের মিল। দুজনেই অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন কাটান। দুজনেই দীনদরিদ্র, শোষিত সাধারণ ভারতবাসীর দুঃখ-কষ্টে বিগলিতপ্রাণ। পার্থিব সম্পদ বা ক্ষমতার প্রতি দুজনেই সমান উদাসীন।

প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগেই সেবারে অ্যালবার্ট হলে জনসভা হল; সেখানে গান্ধীজী বিশদভাবে বললেন, কি অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভবরা রয়েছে। এদেশের জনসাধারণের কাছে গান্ধীজীর বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার খবর খুব সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করল তখনকার প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী)।

বস্তুতপক্ষে গোখলে ও গান্ধীজী, এই দুজনের প্রভাবই প্রফুল্লচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে সবচেয়ে কার্যকরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীজীও প্রফুল্লচন্দ্রকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের সত্তরপূর্তির কালে গান্ধীজী যারবেদা জেলে রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি লিখে পাঠালেন,—

Acharya Roy I had the privilege of knowing for the first time when Gokhale was his next door neighbour in 1901 and I was undergoing tutelage under the latter. It was difficult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simple manners could possibly be the great scientist and Professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students (যারবেদা জেল, ২৪শে মে, ১৯৩২)। অনুবাদ—"আচার্য রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন গোখলে তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। গোখলের কাছেই তখন আমার শিক্ষানবিশী। ঐ দেশী পোশাক পরা সাধাসিধে মানুষটিই যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক তা বিশ্বাস করাই শক্ত ছিল। আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলুম যখন জানতে পারলুম যে তাঁর রাজকীয় বেতনের থেকে মাত্র কয়েকটি টাকা নিজের জন্যে রেখে বাকিটা তিনি দান করেন জনসাধারণের কাজে, বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের সাহায্যার্থে।"

প্রফুল্লচন্দ্রও বলেছিলেন যে তাঁর জনসেবার আদর্শ প্রাণ পেয়েছিল ঐ দুই দেশনেতার সাহচর্যে। তিনি বলেছিলেন, তিনি গান্ধীজীর কাছেই শিখেছিলেন,—Truth lived is a far greater force than truth merely spoken; অর্থাৎ "সত্য আদর্শ কেবল মুখে

প্রচার না করে সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে নেওয়া অনেক বেশি শক্তিশালী প্রচারকার্য হয়ে দাঁড়ায়।"

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্যে বিলেতে গেলেন। খুব সহজে ব্যাপারটি সমাধা হয়নি। যেহেতু তিনি তথাকথিত 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে' চাকরি করেন না, মাত্র 'প্রভিন্সিয়াল' বা প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী তিনি, তাই তখনকার সরকারী আমলাতন্ত্রের পুঁথিপত্রের আইন অনুযায়ী তাঁর সরকারী খরচে বিদেশ যাবার অধিকার নেই। তখন তিনি অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতির শিখরে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে, আবিষ্কারক হিসেবে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তবুও সরকারী আইনের বাধা তিনি কাটাবেন কি করে? তিনি অবশ্য তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তাকে (D.P.I.) জানালেন যে তিনি 'আমন্ত্রণ' পেয়েছেন ইংলণ্ডে যাবার এবং তিনি তা রক্ষা করতে চান। শিক্ষা অধিকর্তার কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। অবশেষে একদিন তাঁর হাতে পড়ল সরকারী একটি নথি, যেখানে লর্ড কার্জন (ভাইসরয়) ও লর্ড কিচেনার লিখছেন যে, যে সকল ভারতীয় গবেষণা প্রভৃতিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন,তাঁরা প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের মত নীচুদরের চাকরি করলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিদেশে যেতে চাইলে তাতে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। ব্যাপারটি ডি. পি. আই-কে জানাতে পেডলার সাহেব (তখন ডি. পি. আই হয়েছেন) প্রফুল্লচন্দ্রকে সমর্থন করে জোরদার চিঠি দিলেন সরকারী কর্তাদের। তিনি যে History of Hindu Chemistry'-র মত অতিশয় মূল্যবান বই লিখেছেন, সে কথার উল্লেখও সেই চিঠিতে ছিল।

সরকার তাঁর ছুটি ও যাবতীয় খরচা মঞ্জুর করলেন। ১৯০৪ এর আগস্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের নামকরা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিগুলি দেখা। ইংলণ্ডে পৌঁছে তিনি কিছুদিন বিখ্যাত 'Davy-Faraday' ল্যাবরেটরিতে কাজ করলেন। ইম্পিরিয়াল কলেজের ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরিগুলিও দেখলেন। ঐ দুই জায়গায়

দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী তখন রয়েছেন, তাঁরা হলেন, স্যার জেম্‌স্ ডিউআর (Dewar) ও স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে (Ramsay)। ডিউআর সাধারণ গ্যাসকে কিভাবে তরল করে ফেলা যায়, সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কাজ করছিলেন। আর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সামান্যমাত্রায় যে সমস্ত গ্যাস রয়েছে (নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন নয়), সেই দুষ্প্রাপ্য গ্যাসগুলি পৃথক করবার ও তাদের পরিচিতি বোঝবার (identification) কাজে নিযুক্ত ছিলেন র‍্যামজে। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের চোখে দেখে কাজগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। লীড্‌স্, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল করে কাটালেন। অধ্যাপক ডিক্‌সন (Dixon), পার্কিন (Perkin), ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড (Frankland) প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌গণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। স্যার উইলিয়ম পার্কিন তখনও বেঁচে (তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে),—যিনি প্রথম অ্যানিলিন-গোষ্ঠির রং আবিষ্কার করেন; বিখ্যাত Perkin's Reaction-এর তিনি প্রবক্তা। তাঁর পুত্র উইলিয়ম হেনরি পার্কিন সম্ভবত সেই সময়ে ম্যাঞ্চেস্টারে অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও বিখ্যাত রসায়নবিদ—'নকল' (synthetic) কর্পূর তৈরি করে নাম করেছেন; স্ট্রিক্‌নিন, তার্পিন (terpene) ইত্যাদির সংশ্লেষণের ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই হেনরি পার্কিনের যোগাযোগ ঘটেছিল। ডাণ্ডী ও এডিনবরা (যেখানে তিনি নিজে ছাত্র ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয় ঘোরার পর এলেন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে। এলেন বার্লিনে (Technische Hochschule ও Reichsanstalt)। বার্লিনে দেখা হল অধ্যাপক এর্ডমান ও অধ্যাপক ভ্যাণ্ট্ হোফে'র (Jacobus Henricus Van't Hoff) সঙ্গে। ভ্যাণ্ট্ হোফ্ ছিলেন ওলন্দাজ রসায়নবিদ, ভৌত-রসায়ন তত্ত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পুরুষ। তিনিই কার্বন পরমাণু ঘটিত বস্তুর অপ্রতিসম (asymmetric) গঠন কল্পনা করেন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি প্রকৃতি বুঝতে তিনিই প্রথম তাপ গতিতত্ত্বের প্রয়োগ করেন।

প্যারিসে এসে প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমেই গেলেন বার্তেলোর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব হল ভারততত্ত্বের পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি'র সঙ্গে। বার্তেলো তো বটেই, সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গেও চিঠিপত্রাদিতে আগে থেকেই তাঁর অবশ্য পরিচয় ছিল। এখন দেখাশোনার মাধ্যমে ঘটল বন্ধুত্বের বন্ধন। প্যারিসেই আলাপ হল অধ্যাপক ময়স্ঁার (Moissan) সঙ্গে। ময়সাঁ তখন প্রবল চাপ দিয়ে কয়লা থেকে কৃত্রিম উপায়ে হীরে সৃষ্টি করে পৃথিবী-বিখ্যাত হয়েছেন। এর আগে নাম করেছিলেন তিনি ক্যালসিয়ম কারবাইড আবিষ্কার করে।

১৯০১ থেকে ১৯১২ ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাসে বড় গুরুত্বপূর্ণ সময়। সাধারণভাবে যাকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয় তার সূত্রপাত যদিও ১৯০৫ সালে, লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে যার আবির্ভাব, তার প্রস্তুতিপর্ব আরও কিছুকাল আগে থেকেই চলছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নেতারা স্বদেশীয়ানা বা জাতীয়তাবাদ প্রচার করছিলেন। সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই যেন তখন নতুন উদ্দীপনার স্রোত। রবীন্দ্রনাথ উদিত হচ্ছেন। বিজ্ঞান যদিও বিশ্বজনীন, তবুও বিজ্ঞান চর্চাও জাতীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশিষ্ট গর্বের বিষয় করে তুললেন প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু। প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry নব জাতীয়তাবাদেরই ফসল, নিজেদের গৌরবময় অতীতকে পুনরাবিষ্কার। প্রফুল্লচন্দ্রের এই প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্য ও সহযোগী হওয়ার জন্যে সাড়া পড়ে গেল দেশের মেধাবী ছাত্র মহলে। এঁদের একত্র করে, শিক্ষা দিয়ে, প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্ ও বিজ্ঞান শিক্ষক উপহার দিলেন—যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট রাসায়নিক বিমান বিহারী দে, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়;

হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কৃতিত্ব সম্বন্ধেই পরে বলতে হবে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র আবার ইংলণ্ডে গেলেন, Congress of the Universities of Empire নামের সভায় যোগ দিতে। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও বন্ধু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। এই যাত্রায় দৈবক্রমে গোখলেও হলেন তাঁর সহযাত্রী।

ঐ সভায় যোগ দিয়ে তিনি বক্তৃতায় বললেন, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যে বেশি সংখ্যায় ভারতীয় ছাত্র নেয়, কারণ, ভারতীয় ছাত্রদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। এই সফরে Chemical Society'-র সভায় প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রবন্ধ পড়লেন তা হল Vapour Density of Ammonium Nitrite। এই কাজটিতে তাঁর দুই ছাত্র, নীলরতন ধর ও তিনকড়ি দে'র নাম ছিল সহকারী হিসেবে। কাজটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে আলোচনা করেছি।

এ যাত্রায় তিনি কেম্ব্রিজ, শেফিল্ড, ডারহাম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক D. Sc. উপাধি দিল। এই বছরেই (১৯১২) ব্রিটিশ সরকার তাঁকে C.I.E. উপাধি দেয়।

তখনও তিনি বিলেতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস চ্যান্সেলর' (উপাচার্য) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে স্যার আশুতোষ লিখছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজ্ঞান কলেজ' খুলতে যাচ্ছেন। রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, 'পালিত প্রফেসর' হতে প্রফুল্লচন্দ্র রাজি কিনা তা তিনি জানতে চান।

যদিও প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের সরকারী অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবের সময়ে বিজ্ঞান

বিষয়ের বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র আহূত হয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সাম্মানিক Doctor of Philosophy উপাধিতে ভূষিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১২-তে বিশ্ববিদ্যালয়ই ব্যবস্থা করেছিল তাঁর ইংলণ্ড সফরের। প্রফুল্লচন্দ্র স্যার আশুতোষকে লিখলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ শুরু হলে তিনি সেখানে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেবেন।

॥ গবেষণার বিবরণ : ১৯০৪—১৯১২ ॥

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে JCS-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি হল—উত্তাপের ফলে মারকিউরিক নাইট্রাইট লবণের বিযোজন (decomposition) বিষয়ে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনেকগুলি 'পেপার' প্রকাশিত হল। 'ডাইমারকারি অ্যামোনিয়ম' গোষ্ঠির কতকগুলি সাল্ফেট ও ফস্ফেট লবণ তিনি আবিষ্কার করেছেন। JCS-এ ছাপা হল 'মারকিউরাস নাইট্রেট' গঠনের তত্ত্ব (theory), আর কি ভাবে মারকিউরাস নাইট্রেটের মত অস্থিত লবণ 'মারকারি-নাইট্রেট' লবণে পরিণত হয় সে বিষয়ের সম্ভাব্য তত্ত্ব। এই বছরেই ছাত্র অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে প্রথম পত্রটি প্রকাশিত হল, বিষয়বস্তু—ক্ষারীয় ধাতুর (alkali metals) ও ক্ষারমৃত্তিকার (alkaline earth) নাইট্রাইট যৌগের গঠন। অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পেপার,—সিলভার নাইট্রাইটের গঠন ও তার দুইটি রূপ।

মজার কথা এই যে যখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কাজে বাংলা ভাষায় বই লেখবার জন্যে তিনি কলম ধরলেন তখন তিনি লিখলেন 'সরল প্রাণীবিজ্ঞান'! প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী বাংলা বই আর তিনি লেখেন নি। অবশ্য বাংলা-ভাষায় বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, কিন্তু তা প্রধানতঃ বড়দের উদ্দেশ্যে। 'প্রকৃতি' পত্রিকায় তিনি সহজ ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন,— 'প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে', বা 'অক্সিজেন ও তাহার আবিষ্কার', 'সুন্দরবনের গণ্ডার'—ইত্যাদি। এগুলি সর্বজন উদ্দেশ্যে।

তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ও 'প্রবাসী'তে। নবকান্ত কবিভূষণের সঙ্গে মিলে লেখেন 'চরক ও সুশ্রুতের কাল নিরূপণ' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯০১) ও 'আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব' (ঐ পত্রিকায়, ১৯০৩); 'বিজ্ঞানসভা, পুরাতন ও নূতন' (প্রবাসী, ১৯০৪), 'উদ্দীপনা' ও 'প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র' (প্রবাসী, ১৯০৫)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লেখেন 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি'। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়। সেখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন,—'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, মানিকলাল দে, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার। এঁদের সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ। অনেকেই তখন হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে খাওয়া করতেন। ওদের সঙ্গে বেশি করে মিশতেন। আর দুই ছাত্র ছিলেন, ফার্নাণ্ডেজ ও রাজেন্দ্রনাথ দে। মেঘনাদ ও সতেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যদের তিনি এম. এস. সি.'র রসায়ন ক্লাশে ছাত্র হিসেবে পেলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তাঁর তিন ছাত্র, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী ও অতুলচন্দ্র ঘোষ, এঁদের সঙ্গেই একত্রে তিনি নাইট্রেট লবণের বিষয়েই গবেষণা চালাচ্ছেন,—অন্ততঃ প্রকাশিত পেপারে তাই দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Notes from Presidency College নামের প্রবন্ধাবলীর অন্যতমটি হল Silver mercuroso-mercuric nitrite বিষয়ের বিবরণ। ঐ বছরই JCS'এ প্রকাশিত হল Double nitrites of mercury and the alkyl metals নামের পেপার। অধ্যাপক আর্মস্ট্রং (Armstrong) এক সময়ে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন Master of Nitrites' বলে। সত্যিই তিনি

এতগুলি 'নাইট্রাইটের' মত অস্থিত লবণের যৌগ তৈরি ও তাদের ধর্ম বিশ্লেষণ করেছিলেন যে ঐ বিষয়টিতে অন্ততঃ পৃথিবীর অন্য কোন গবেষক রসায়নবিদ অন্য কোনও কথা বলবার সুযোগ পান নি।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল History of Hindu Chemistry'র দ্বিতীয় খণ্ড। ঐ বছরই তিনি ছাত্রদের জন্যে পাঠ্য বই Elementary Inorganic Chemistry প্রকাশ করলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখযোগ্য পেপার হল,—ছাত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে Ionisation of Nitrites as measured by the Cryoscopic method নামের। আবার ঐ একই বছর সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য কাজের খবর পাচ্ছি,—হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে The Rasarnavam নামের পেপার, এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং 'সুপ্রভাত' নামের একটি বাংলা পত্রিকায় তাঁর অন্যতম বিতর্কমূলক প্রবন্ধ, 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার'। সিটি বুক সোসাইটি শেষোক্ত প্রবন্ধটি ইংরেজী পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করল, Bengali Brain and its Misuse এই নাম দিয়ে। এই প্রবন্ধটির সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে বলতে হবে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দেখতে পাচ্ছি তাঁর দুই মেধাবী ছাত্র, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও হেমেন্দ্রকুমার সেন তাঁর সঙ্গে একত্রে পেপার ছাপাচ্ছেন; ইথাইল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট, টেট্রামিথাইল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট, বেনজাইল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট ইত্যাদি জটিল যৌগ বিষয়ে খুবই উচ্চস্তরের গবেষণার ফলাফল সেগুলি।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র নীলরতন ধরের সঙ্গে মিলে তাঁদের যৌথ গবেষণার ফলাফল ছাপাতে লাগলেন। জিতেন রক্ষিত ও রসিকলাল দত্ত যদিও বিভিন্ন জটিল নাইট্রাইট সৃষ্টির কাজই করে চলেছিলেন, নীলরতন একটু অন্য রকমের কাজ করলেন। তিনি দেখালেন, ৮০° সেলসিয়াস উত্তাপে অ্যালকিল অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট বিযোজিত না হয়ে সরাসরি ঊর্ধ্বপাতিত হয়। এই কাজটিই প্রফুল্লচন্দ্র

লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় বর্ণনা করেছিলেন। Nature পত্রিকায় কাজটির অসম্ভব প্রশংসা করা হয়। নীলরতনের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্য একটি পেপার হল,—পটাশিয়ম নাইট্রাইটের 'আণবিক পরিবাহিতা' বিষয়ে। দেখা যাচ্ছে ক্রমশঃ নতুন যৌগ সৃষ্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার নতুন বিষয়, ভৌত-রাসায়নিক (Physical Chemistry) গবেষণার দিকে তিনি নজর দিচ্ছেন।

॥ ১৯১২—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ ॥

১৯১২'র ইংরাজি নববর্ষে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দিন পঞ্জিকায় লিখেছেন, —An eventful year in my career has just closed. Last year about this time and later on the repeated relapse of malarial fever filled me with grave anxiety, not on my personal account but because of the investigations on the amine nitrites, which I feared might be severely interfered with. It has pleased the beneficient Almighty Father to restore me to my health so that I might carry on the destined work.

Perhaps the busiest and most fruitful year of my activities in the research work. A noble band of youth devotedly attached to chemistry for its own sake have gathered round me and I consider them as the most precious gift of God.

The B. C. P. W. affairs fairly looked up and the management should be decided.

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই পড়াতে লাগলেন। কিন্তু ফিরে এসে স্যার আশুতোষের

সঙ্গেও দেখা করলেন ; ক'রে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার ইচ্ছের কথা জানালেন তাঁকে। সার্কুলার রোডে, স্যার তারকনাথ পালিতের দান করা জমির ওপরে তখন গড়ে উঠছে বিজ্ঞান কলেজের বিরাট বাড়ি। যথা সময়ের একবছর আগেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের 'স্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক' হিসেবে যোগ দিলেন।

তাঁর সরকারী চাকরি সম্বন্ধে দুচার কথা বলা দরকার। তখনকার ব্রিটিশ পরিচালিত 'ভারত সরকার' তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। তাঁকে ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিস দেওয়া হয়নি। মাত্র ২৫০ টাকা বাঁধা মাইনেতে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে 'অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক' হিসেবে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে আপীল করায় তখনকার ডি. পি. আই., স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ কি অপমান-জনক মন্তব্য করেছিলেন, তার কথা আগেই বলেছি। মনে হয় এডিনবরায় ছাত্রাবস্থায় India Before and After Mutiny নামের যে বইটি তিনি লিখেছিলেন, তা'তে ভারতের ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ছিল, ইংরেজ কোনদিনই তা ভুলতে পারেনি। পরে তাঁকে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগেই স্থায়ী পদে অধ্যাপক করা হয়। বেতন ৪০০৲—৭০০৲ স্কেলে দেওয়া হতে থাকে, তবুও তাঁকে অধিকতর সম্মানীয়, I. E. S. শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হয়নি। তিনি যখন খুবই উঁচুদরের গবেষণা করছেন, তখন একবার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তাঁকে বদলি করা হয়। তিনি রাজসাহী যেতে রাজি হলেন না। আরও পনেরো বছর কেটে গেল, তিনি অন্ততঃ ৪০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন ইতিমধ্যে, History of Hindu Chemistry'র মত অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেণামূলক অনন্যসাধারণ বই লিখেছেন, তবুও তাঁকে উচ্চতর পদে 'প্রোমোশন' দেওয়া হয়নি। ফলে যে কোনও ছোকরা ইংরেজ অধ্যাপক IES হয়ে এসে তাঁর ওপরওয়ালা হয়ে মাতব্বরী

করতে পারত। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১০০ টাকা বাড়তি ভাতা দিয়ে তাঁকে অস্থায়ীভাবে IES শ্রেণীর পদ দেওয়া হল। ভাতা পরে বেড়ে ১৫০ টাকা হলেও স্থায়ীভাবে সিনিয়র IES পদ তিনি কখনই পান নি। তাঁর তীব্র স্বদেশীয়ানাই বোধ হয় বাধ সেধেছিল।

১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড আইলিংটন (Lord Islington) এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্যে একটি কমিশন নিয়ে আসেন, তখন প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের শিক্ষাবিভাগে অবিচারের উদাহরণ হিসেবে নিজের চাকরির ব্যাপারটি তুলে ধরেন। কিভাবে দেশীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতচর্ম সাহেবরা অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সুযোগ পেতে পারে, তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাঁর নিজের ব্যাপারটিই।

সরকারী চাকরির তুলনায় স্যার আশুতোষের ব্যবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনেক বেশি সম্মান দেখিয়েছিল যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'পালিত প্রফেসর' করা হয়। আগেই বলেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের খরচে তাঁকে ও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে Congress of the Universities of the British Empire-এ যোগ দিতে ১৯১২ সালে বিলেতে পাঠিয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্রেরই ইচ্ছেমত তাঁর ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় 'রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ করল। তিনিও স্যার আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলতে সর্বোতোভাবে সাহায্য করতে লাগলেন।

স্যার তারকনাথ পালিতের যে জমিতে বিজ্ঞান কলেজের বাড়ি গড়ে উঠল, তার পাশেই একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন প্রফুল্লচন্দ্র। ঐ বাড়িটিতেই বেঙ্গল কেমিক্যালের পত্তন হয়। এখন, ১৯১৭'য়, তাঁর সবটুকু সময় বিজ্ঞান কলেজকে দেওয়ার জন্যে তিনি কলেজেরই দক্ষিণদিকে দোতলার একটি ঘরে পাকাপাকিভাবে বাস করতে লাগলেন। ১৯৪৪, অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজের ঐ ঘরেই তিনি বাস করে গেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের যে দিকটি আমাদের বাঙ্গালী সমাজে বেশি

পরিচিত তা হল তাঁর জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্তি আর সেই উৎস থেকেই উদ্ভূত সমাজসেবার আগ্রহ। পরে একাধিক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বলতে হবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে দেখতে পাই তাঁর সহানুভূতির সিংহভাগ রয়েছে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের জন্যে। তিনি যে বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র কেনবার টাকাও কখনও কখনও জুগিয়েছেন তার প্রমাণ আছে। ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁর বিশ্লেষণী মানসে সর্বদাই ধরা পড়েছে। সামাজিক উন্নতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকারী অনাগ্রহ তাঁকে দুঃখিত করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশ যখন বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে, তখনও সরকারের চরম ঔদাসীন্য তাঁকে টেনে এনেছে ল্যাবরেটরির গজদন্তমিনার থেকে দেশের মাটিতে, দেশের দীন ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে। ১৯১৩'র দামোদরের বন্যায় যখন পশ্চিমবাংলার সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ভেসে গেছে, অসংখ্য মানুষের সেই চরম দুর্দশা ও বিপদের দিনে তিনি সাহায্যকারী দল গড়ে ছুটে গেছেন গ্রামে গ্রামে। সঙ্গে বৃহৎ আগ্রহী ছাত্রবাহিনী।

॥ বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার ॥

আগেই বলেছি, তিনি 'সুপ্রভাত' নামের একটি বাঙ্গলা পত্রিকায় ঐ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সিটি বুক সোসাইটি সেটির ইংরেজি রূপান্তর, Bengali Brain and its Misuse নামে ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা আকারে ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝতে হলে তাঁর এই প্রবন্ধটির সারাংশ বুঝতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত দেশী লোকের দোষ, ত্রুটী, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনি বিচার করেছেন। দেখিয়েছেন,—বাঙ্গালীর নিজের গড়ে তোলা সমাজের নানান কুসংস্কার, বাধা-নিষেধ কিভাবে বিভিন্ন শতাব্দীতে বাঙালী জাতের প্রকৃত উন্নতির পথে দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতির বিধান সমগ্র ভারতীয় সমাজকেই আবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে রেখেছিল। মনুর বিধান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করেছে। সমাজকে বেঁধেছে জাতিভেদ ও নানা অবৈজ্ঞানিক সংস্কারের নিগড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন, মনুর বিধানের ফলেই সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষরা ক্রমশঃ নিজের হাতে করতে হবে, এমন বৃত্তিমূলক কাজকে 'নীচু কাজ' বলে অবজ্ঞার চোখে দেখেছে ; সুতরাং,—Her soil was rendered morally unfit for the birth of a Boyle, a Descartes or a Newton ; এ দেশের মাটিতে বয়েল কিংবা দেকার্তের মত বৈজ্ঞানিক গাণিতিক সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব ছিল না। আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে বৈদেশিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্বন্ধে সচেতনতাকে শেষ করে দিয়ে এদেশের শিক্ষিত সমাজকে কূপমণ্ডুক করে তুলেছে। কৌলীন্য প্রথা অশেষ দোষের আকর

হয়েছে। বারেন্দ্র, রাঢ়ী, ভজঙ্গ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে সমাজের মধ্যে বিভেদ বুদ্ধিকেই জোরদার করেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন,—শ্রীচৈতন্যের ধর্মবিপ্লব বিভেদগুলি কমিয়ে দিয়ে সমাজকে একদা শক্তিশালী করলেও চৈতন্য-চেতনা ক্ষণস্থায়ী হল। অল্পদিনেই আবার সেই ধর্ম তথা সামাজিক আলোড়নে ভাঁটার টান এল। তবুও প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন, 'শ্রীচৈতন্য'-ঘটনা না ঘটলে হয়ত এদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শতকরা ৯৫ ভাগই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করত।

স্মার্ত রঘুনন্দন হয়ত চিন্তাও করতে পারতেন না, তাঁর প্রবর্তিত বিধান বাংলা দেশকে একদিন যে পঙ্কে নিক্ষেপ করবে তার নাম হচ্ছে মানুষের প্রতি উদাসীনতার ফলশ্রুতি,—দেশপ্রেমহীনতা। প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন,—The noblest gift of God—patriotism—had no meaning for the Bengalee; তিনি কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা History of Bengal under the Nawabs নামের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন,—(অনুবাদ) "ব্যক্তিবিশেষ হল সমাজেরই উৎপন্ন বস্তু। মুসলমান গৌরবের অবসান ও ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের সময়ে এদেশী হিন্দুদের নানাবিধ কুকর্ম চিরকালের মত দেশীয়দের মুখ কালিমালিপ্ত করেছে।" সত্যিই, প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন, মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। কিন্তু গোড়ার দিকে, যখন তারা এদেশীয়দের সাহায্য ছাড়া দেশ চালাতে পারত না, তখন বহু বাঙ্গালীকে রাজস্ববিভাগে তারা কাজ দিয়েছিল। কিন্তু সেই সব বাঙ্গালীর অসাধু কাজকর্ম বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রকেই চিরকালের মত কালিমালিপ্ত করেছে।

বাঙ্গালী আরও বড় সুযোগ নষ্ট করেছে। ইংরেজ প্রথম দিকে কাশিমবাজার, সুতানটি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি জায়গায় 'ফ্যাকটরি' (সুতাকল) তৈরি করেছিল। সে সময়েও এদেশী ভাষা ও রীতিনীতি না জানা থাকার জন্যে তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল বাঙ্গালী দালাল, মুৎসুদ্দি, বেনিয়াদের ওপরে। এরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল।

বিখ্যাত বিখ্যাত বাঙ্গালী ধনী বংশের উদ্ভব এই সময়ে। কিন্তু এই-সব ধনীরা, যারা খুব সহজেই খুব বেশি ধন উপার্জন করেছিল, তারা বিলাসিতা করেই সেই অর্থ ব্যয় করতে তৎপর হয়ে উঠল; তারা ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলতে সে অর্থ কাজে লাগাল না। ইতিমধ্যে বিদেশী বণিকশক্তি, যারা রাজশক্তি দখল করেছিল, তারা ক্রমশঃ এদেশীয় রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠে তারপর বাঙ্গালী মুৎসুদ্দীদের আর দরকার বোধ করল না। বাঙ্গালী অবশ্য বিদেশী বণিকদের আসেপাশে থাকতে বাধ্য হল কিন্তু তা হল সামান্য মাইনের কেরানী হিসেবে। ইতিমধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু কিছু শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে বাঙলায় এসে ভিড় করতে লাগল বোম্বাই, গুজরাট, বিকানীর ও মধ্যপ্রদেশের বণিকশ্রেণী। তারপর শিল্প জগতে বিপ্লব আনল বাষ্পশক্তির ব্যবহার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগ থেকেই তারা ভারতে তৈরি সুতিকাপড়, মসলিন ইউরোপে রপ্তানী করত। এখন ব্যাপারটা বিপরীতমুখী হয়ে গেল। ম্যাঞ্চেস্টারের বাষ্পচালিত কলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় বোনা হতে লাগল। এদেশের ঢাকা, শান্তিপুর, চন্দননগরের তাঁত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

বিগত পঞ্চাশ বছরে[১] বোম্বাই প্রদেশ রীতিমত লড়াই করেছে যন্ত্রচালিত সূতাকল ও বস্ত্রবয়নশিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে। বোম্বাই 'সময়ের ঝুঁটি ধরে' (take the time by the forelock) তাকে বাগ মানাতে পারল কিন্তু দুঃখিনী বাঙলা মায়ের অতিবুদ্ধিমান সন্তানদের ঘুম ভাঙ্গল না। বরং বাঙলার ভূমি-আইনের জটিলতার সুবাদে এই প্রদেশে তৈরি হল দুঁদে উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টারের শিকারী-দঙ্গল যারা ইংরেজি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, সবই কাজে লাগাল হয় আইনজীবী, নয় কেরানী শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়াসে। "From the Punjab to Burmah there has thus been an unending chain—a network of Bengalee

(১) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এ কথা লেখা হচ্ছে।

Keranis." কেরানীর চাকরি করতে করতে, ওপরওয়ালাদের মনস্তুটি করতে করতে বাঙ্গালী যুবকশ্রেণীর মেরুদণ্ড নরম হয়ে গেল। সমগ্র বাঙ্গালী জাতটারই আত্মসম্মানবোধও তলানিতে এসে ঠেকল।

প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন,—স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালীর সামনে সুযোগ এনে দিয়েছিল আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু ততদিনে বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সুগভীর উদাসীনতায় আমরা ততদিনে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, দুদিকেই সামান্যমাত্র অধিকারও হারিয়ে ফেলেছি। (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতীয় মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার ওপর। এর এত ক্ষুদ্র অংশে আমাদের অবদান রয়েছে যে তা প্রায় চক্ষুগোচর হবার মত নয়। আমাদের জাতীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সরকারী কেরানীগিরির ওপরে। পরিশ্রমী পশ্চিমা ও মারোয়াড়িরা ঐ বাণিজ্যের সিংহভাগ দখল করে বসেছে। বাঙ্গালী ছেলেরা ব্যবসা জানে না ; তাদের উচিত, যাদের তারা "বোকা" ও "ছাতুখোর" বলে, তাদের কাছে ব্যবসা শেখা। "Much of the success in business depends upon being able to grasp the psychological moment. The man brought up in commercial pursuits becomes self-reliant ; he learns to stand on his own legs and grows in resourcefulness. In short, some of the noblest qualities of man are thus called into play."

প্রফুল্লচন্দ্র দুঃখ করছেন,—স্বদেশী আন্দোলন আমাদের সামনে শিল্প প্রতিষ্ঠার নতুন সুযোগ এনে দিলেও আমরা তা উপেক্ষা করেছি ; বোম্বাই ও গুজরাটের মিল মালিকরাই সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। বাঙ্গালী যুবক জীবনের শুরুতে ৩০।৪০ টাকা মাইনের কেরানীগিরি পেলেই মহা খুশি হয়ে মনে করেছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে গেছে। বাঙ্গলার সর্ববৃহৎ শিল্প দাঁড়িয়েছে পাট-শিল্প ; হুগলী নদীর

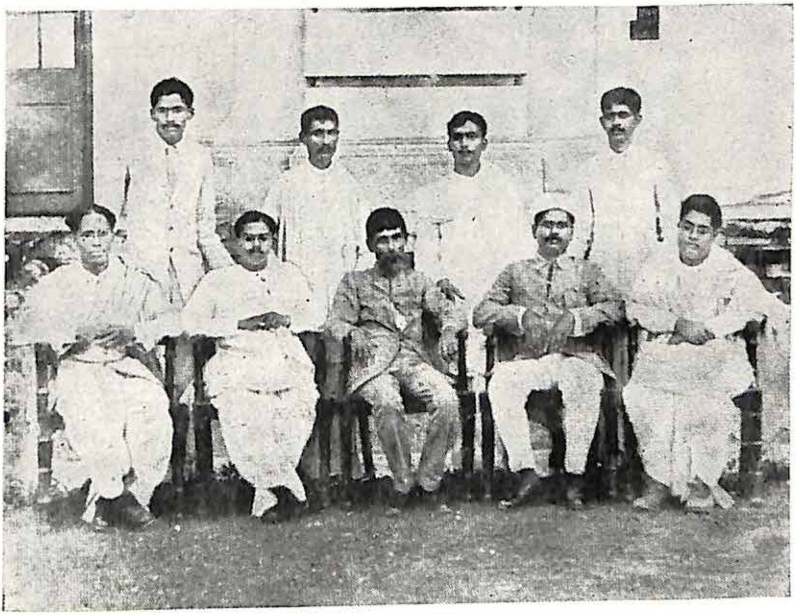
দুই তীরে অন্ততঃ ৪০টি পাটকল রয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিরও মালিকানা বাঙ্গালীর নয়।

অনেকে ভান করেন, বাঙ্গালী পার্থিব সম্পদ লাভের জন্যে উন্মুখ নয়; তাদের লক্ষ্য পারমার্থিক লভ্য। প্রফুল্লচন্দ্র ঘৃণার সঙ্গে একথার প্রতিবাদ করেছেন। বাঙ্গালী পার্থিব সম্পদের জন্যে নিশ্চয়ই লালায়িত,—সম্পদ গড়বার উপায় সে ভুলে গেছে। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, জ্ঞানস্পৃহা, বাঙ্গালী সামান্য কেরানীগিরির স্বার্থে ত্যাগ করেছে। যে ইউরোপীয়কে ঐহিকতাসর্বস্ব বলে বাঙ্গালী প্রচার করে, জ্ঞানস্পৃহা তাদের মধ্যেই কাজ করে চলেছে। নিউটন, ফ্যারাডে, সিলী, পাস্তর, বার্তেলো—কেউ বাঙ্গালী নন। যদি বর্তমানকালে প্রকৃত ঋষির খোঁজ করতে হয় তবে তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে ইউরোপ বা আমেরিকায়। বাঙ্গালী শিক্ষার 'ভড়ং' ততক্ষণ বজায় রাখে যতক্ষণ না বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা জোটে,—তারপরই সে ডিপ্লোমা হাতে ছোটে কেরানীগিরির খোঁজে। কে তখন জ্ঞানচর্চার ধার ধারে? সুতরাং তথাকথিত 'ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী'র সত্যিকারের কোন দাম বাঙ্গালীর ছেলের কাছে নেই।

এই ভাবেই প্রফুল্লচন্দ্র ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজ শাসিত ভারতেই বাঙ্গালীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন আর তার কারণ নির্দেশ করে দুঃখ করেছেন। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা করলাম, তার কারণ ঐ একটি রচনায় বাঙ্গালীর দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে প্রফুল্লচন্দ্র যা বলতে চেয়েছেন, তাঁর সমগ্র জীবনকালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালীর ও অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখেন নি। তাঁর সেই ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী বাঙ্গালীর কানে প্রবেশ করেনি—"এখনও বাঙ্গালী জাগো, নচেৎ তোমরা দৈনিক কুলি-মজুরে পরিণত হইবে। এমন কি এইরূপভাবে চলিলে ৫০ বৎসরের ভিতর বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা একটি জাতি গঠন হয় না, কিংবা তাহাতে জাতির নামও প্রতিষ্ঠিত হয় না।" তিনি নিজে সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি।

তিনি ১৯২০ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, প্রধানতঃ 'প্রবাসী' পত্রিকায়, বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯২৩ বসুমতীতে লিখছেন—'অন্ন-সমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা'। ঐ একই পত্রিকায় (১৯২৪) লিখেছেন—'বাঙ্গালীর শক্তি সামর্থের অপব্যবহার ও বর্তমান সমস্যা'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৯২৯) লিখেছেন.—'কৃষি, ব্যবসা ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সমস্যা'; আবার ঐ পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখছেন 'ডিগ্রির অভিশাপ'। পরের বছরের 'ভারতবর্ষে লিখেছেন—'বাঙ্গালীর শক্তি ও তাহার অপচয়'। ১৯৩৩-এ লিখেছেন,—'বর্তমান শিল্পপদ্ধতি ও জীবন সংগ্রামে তাহার মূল্য' (প্রবাসী); 'শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর পরাজয়' (প্রবাসীতে, ধারাবাহিক ভাবে)। ঐ পত্রিকায় একাধিক সংখ্যায় আরও লিখেছেন (১৯৩৩)—'বাঙ্গালী কোথায় গেল?', 'শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর বিরোধিতা', 'শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার পরাজয়—ঝাড়ুদারী ও ভাবী উন্নতির উপায়'; 'প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী' (ভারতবর্ষ); ঐ পত্রিকাতেই—'বাঙ্গলার জমিদারবর্গ' (ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত); 'খুলনাবাসী' পত্রিকার—'বাঙ্গালীর দাস মনোভাব'; 'দেশ' পত্রিকায়—'অন্নসমস্যা ও শিক্ষার বাহন' (২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩), প্রভৃতি। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন,—'কলেজে ছাত্রদের অপব্যয়' (ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা); 'গৃহস্থমঙ্গল' পত্রিকায়—'মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বেকার সংখ্যা'। ১৯৩৫-এ লিখছেন,—'অন্ন-সমস্যা ও গোপালন' (প্রবাসী); ১৯৩৬-এ 'চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি' নামের প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করল তাঁর পুস্তিকা,—'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' এবং 'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়'।

এছাড়া বহু বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর ভাষণে মূলতঃ ঐ একই বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' মূল সভাপতির ভাষণের শিরোনাম—'বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।'



ছাত্রদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র (১৯১৪-১৫)
বসে : (বাঁদিক থেকে) পুলিনবিহারী সরকার, অমরেশ চক্রবর্তী, আচার্য রায়,
টি. এস. মুট্টু, সত্যেন বসু।
দাঁড়িয়ে : (বাঁদিক থেকে) মেঘনাদ সাহা, উপেন্দ্রনাথ কর্মকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে)।

স্বদেশী আন্দোলনের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের নতুন উন্মেষ প্রফুল্লচন্দ্র নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন। এক সময়ে গোখলে ও গান্ধীজির এই বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী সর্বভারতীয় নেতার সম্মান পেয়েছেন। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেই ভারতীয় জাতীয়তা-বোধের অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র কেন কেবলই বাঙ্গালীর কথা ভেবেছেন? বস্তুতপক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনেকে বদনাম দিয়েছে এই বলে যে তিনি 'প্রাদেশিকতা বোধে' পীড়িত। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে প্রফুল্লচন্দ্রের দেশাত্মবোধই এই দেশের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যার নাম 'বাঙ্গলা'; তার দুঃখকষ্ট ও সমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। বাঙ্গলার কথা তিনি ভেবেছেন ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার প্রতীকারের কথা বলেছেন এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসেবেই। ১৯৩৫ সালে যখন ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এক চিঠিতে তাঁকে 'প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্ন' বলে অনুযোগ করেন, তার জবাবে তিনি লিখছেন,—I have given in my book an estimate of ten crores per month, i.e., 120 crores per year—drained away by the non-Bengalis excluding Europeans—from unhappy Bengal.

I have, repeatedly, to point out these out of agony but not out of jealousy. If a Bengali, often domiciled, were to get a Government job worth 50 or 100 rupees, a hue and cry is raised by the Oriyas and Beharis though the economic conquest of Bengal is almost complete by these very people.

"কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে রক্ত সঞ্চার হলে তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না"; তেমনই, মুখমণ্ডল থেকে ক্রমাগত রক্ত যদি দেহের অন্যত্র শোষিত হয়ে যায়, তবে তাও সুস্থ দেহের লক্ষণ নয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদী হিসেবেই, দেশের অন্যান্য অংশের

তুলনায় বিশেষ একটি অংশের অর্থনৈতিক শোষণজনিত দুর্দশা যদি তাঁকে ব্যথিত করে থাকে, তবে তাঁকে 'প্রাদেশিক' বলে বর্ণনা করা উচিত হবে না,—বিশেষতঃ যখন এই 'দুর্দশার' জন্যে তিনি ঐ অংশের অধিবাসীদেরই দায়ী করেছেন।

জাতীয়তাবাদী প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে যথাসময়ে অন্যত্র আরও বেশি বলতে হবে। বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসেবেই প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে জ্ঞান বিস্তারের কাজ আর অন্যদিকে ব্যবসায়ে ও অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠালাভ, দু'দিকেই দু'হাতে লড়াই করে গেছেন।

॥ ১৯১২—১৬ ঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের বাকি দিনগুলি ॥

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন ধরের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র যে কাজ করেছিলেন,—অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইটের মত অস্থায়ী ও উদ্বায়ী পদার্থের বাষ্পীয়-ঘনত্ব নির্ধারণ,—সেই কাজটি অসাধারণ প্রশংসা পেয়েছিল। নীলরতন এলাহাবাদের সরকারী Muir Central College-এ অধ্যাপকের চাকরি পেলেন, পেলেন I.E.S. শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার। এলাহাবাদে নীলরতন অনেক নতুন বিভাগে কাজ শুরু করেছিলেন; সেখানে তিনি বিশেষ মেধাবী ছাত্রগোষ্ঠি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। Photochemistry ও Colloid Chemistry তাঁর বিশেষ গবেষণার বিষয় ছিল। পরে তিনি মৃত্তিকা-রসায়নে বিশেষজ্ঞ অগ্রজ বিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, স্থাপনা করেন Sheila Dhar Institute নামের গবেষণাগার।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রসিকলাল দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, এঁদের কেউই প্রেসিডেন্সী কলেজে রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগ না দিলেও সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী হিসেবে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেছেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করলেন জিতেন রক্ষিতকে। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত B. Sc. পাশ করতে পারেন নি। কিন্তু অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের হাত ছিল তাঁর। তিনি কাচের জিনিস তৈরি—glass blowing—খুব ভাল পারতেন। সত্যিকারের ভাল গবেষক হতে গেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী'র দরকার নেই, এ কথা বোঝাবার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই জিতেন রক্ষিতের উদাহরণ দিতেন। তিনি জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে আটটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। জিতেন্দ্রনাথ পরে গাজিপুরে সরকারি আফিং তৈরির কারখানায় 'কেমিস্ট' হিসেবে চাকরি পান। মর্ফিয়া ও কোডিনের

(codeine) প্রাককলন (estimation) পদ্ধতির যে প্রক্রিয়া তিনি নির্ধারণ করে গেছেন সেটিই প্রামাণ্য রসায়ন পুস্তকগুলিতে গৃহীত হয়েছে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। চন্দ্রভূষণের ব্যবস্থায় ল্যাবরেটরিতে রসায়নগুলির অভাব হল না। ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র জানা, রাজেন্দ্রলাল দে, ফার্নাণ্ডেজ ও মাণিকলাল দে'র সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইটের ও thiocarbamide ও thioacetamide সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

॥ ১৯১৬ ও তারপর। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ ও প্রফুল্লচন্দ্র ॥

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র 'স্যার তারকনাথ পালিত প্রফেসর অব কেমিস্ট্রী' পদে যোগ দিলেন। স্যার আশুতোষের একাগ্র ইচ্ছা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তোলা। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে এই কাজে প্রফুল্লচন্দ্রের পাশে সাহায্য করবার মত কেউ ছিল না, একমাত্র তাঁরই ছাত্র প্রফুল্ল মিত্র ছাড়া। পদার্থতত্ত্ব বিভাগের প্রধান দুই অধ্যাপক,—'পালিত-প্রফেসর' চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন তখনও ভারতীয় হিসাব বিভাগের চাকরি থেকে ছাড়া পাননি। 'স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর' দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৯১৬'তে জার্মানীতে অন্তরীন রয়েছেন (তখন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানীতে ব্রিটিশ-প্রজা হিসেবে ভারতীয়েরা সকলেই অন্তরীন অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন)। শুধু তাই নয়, বস্তুতঃ স্যার আশুতোষের অমিত সাহস থাকলেও বিজ্ঞান কলেজ চালাবার মত যথেষ্ট সঙ্গতি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। সরকারী কমিশন বসেছে কিন্তু টাকাকড়ি সরকারী হাত দিয়ে নির্গত হচ্ছে না। বাৎসরিক মাত্র ১২০০০ টাকা সরকারী বরাদ্দ ছিল বিজ্ঞান কলেজ চালাবার খরচা হিসেবে। এই অবস্থাতেও প্রফুল্লচন্দ্র নিজের ছাত্রগোষ্ঠি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন!

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই বিশিষ্ট ছাত্র। এঁরা পরে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন। জ্ঞান মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন 'খয়রা অধ্যাপক' ও পরে রসায়ন বিভাগে 'রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক'। অন্যান্য বিশিষ্ট ছাত্র, যাঁরা পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন,—যাঁরা বিজ্ঞান কলেজের সেই প্রথম যুগ থেকে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়েছেন,—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, পুলিনবিহারী সরকার, প্রফুল্লকুমার বসু, রাজেন্দ্রলাল দে, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ।

॥ বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার বিবরণ ॥

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলে হাইড্রোজেন ও সালফারযুক্ত যৌগ, 'মারক্যাপটান'-এর সঙ্গে মারকিউরিক নাইট্রাইটের বিক্রিয়া বিষয়ে। তিনি দেখালেন, এই বিক্রিয়ার ফলে জটিল অণু 'মারকারি মারক্যাপ্‌টাইড নাইট্রাইট' তৈরি হয়। সেই—মারক্যাপ্‌টাইড নাইট্রাইট যদি অ্যাল্‌কিল্‌ আয়োডাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তবে একটি বিচিত্র গঠনের অণু তৈরি হয়,—সেটি একটি 'সালফোনিয়ম' যৌগ আর এর একটি বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠন আছে। সেই গঠনমূলক 'ফরমূলা' নির্দিষ্ট করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি আরও দেখালেন, ঐ বিচিত্র সালফোনিয়ম যৌগটির একটি অদ্ভুত গুণ আছে,—তা হল তার আলোকানুবর্তিতা (Phototropism)।

শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করলেন এই ধরনের বিচিত্র গঠনযুক্ত বৃহৎ-অণু আবার ক্রমাগত সালফার পরমাণু-সমৃদ্ধ 'অণু-অংশ' (গ্রুপ) যুক্ত করে নিয়ে নিয়ে 'বৃহত্তর শৃঙ্খল-যুক্ত' (long chain) যৌগ তৈরি করতে পারে। আমরা জানি, তখনও প্ল্যাষ্টিক জাতীয় 'বৃহৎ-শৃঙ্খল-যুক্ত' অণুর আবিষ্কার হতে অনেক দেরি। এই ধরনের অণুর আবিষ্কার রসায়ন শিল্পকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে, কত অসংখ্য নতুন বস্তু

ব্যবহারিক কাজের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সালফারযুক্ত দীর্ঘ শৃঙ্খলিত অতিকায় অণু, যার কথা প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, তার গুরুত্ব বেশি লোকে বোঝেনি। বস্তুতঃ সালফারযুক্ত দীর্ঘশৃঙ্খল-অণুর বিষয়ে,—যেগুলি সম্বন্ধে তিনি বলে গিয়েছিলেন,—সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। জটিল (complex) মারক্যাপটান অণু বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়[১] লিখছেন,—Those who were privileged to see him work in the laboratory could not fail to notice his remarkable skill in separating complex mixtures. His experimental skill was comparable to that of W.H, Perkin (Jr.). There may be many views as to the mechanism of formation of these compounds—he did everything he could to establish their constitutions. All the physico-chemical methods known at that time were pressed into service to prove the structures he assigned to these compounds. অর্থ,—"তাঁকে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেখার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন জটিল রাসায়নিক যৌগগুলিকে বিশ্লেষণ করবার কি অদ্ভুত দক্ষতা তাঁর ছিল। তাঁর 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের' হাত W.H. Perkin (Jr.) এর সমকক্ষ ছিল। ঐ যৌগগুলির (প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্ট দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত সালফার-সমৃদ্ধ বৃহৎ অণুগোষ্ঠির যৌগগুলি) গঠনের প্রকৃত কৌশল বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে,—কিন্তু তদানীন্তন পরিজ্ঞাত সমস্ত রকমের ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়াই তিনি কাজে

১। Acharya Ray and Chemical Research in Modern India, J.N. Ray, Journal of Indian Chemical Society, ৩৮ খণ্ড, ১৯৬১

লাগিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট ঐ যৌগগুলির রাসায়নিক গঠন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে।

সালফার সমৃদ্ধ দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত আর এক ধরনের অণুও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তা হল ব্রোমিনযুক্ত $Br—C_2H_4-(SC_2H_4)_{1,2,3,\cdots}$-Br অণুগুলি। এই ধরনের বৃহৎ অণুর বিষয়েও আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন,—একথাও জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন (১৯৬১'তে)।

প্রফুল্ল কুমার বসু ছিলেন আচার্য রায়ের আর এক মেধাবী ছাত্র (যিনি কেন্দ্রীয় লাক্ষা গবেষণাগারের অধিকর্তা হয়েছিলেন)। তাঁর সঙ্গে একত্রে প্রফুল্লচন্দ্র purine-শ্রেণীর জটিল 'মারক্যাপ্‌টান' অণু গঠন করেন। এই ধরনের অণু পুষ্টিক্রিয়ায় বাধা দান করে বলে জানা গেছে আর সেজন্যে এদের গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল বর্তমানেও আছে।

এ সময়ে গবেষক প্রফুল্লচন্দ্র যে অসংখ্য কাজ করেন তার বিবরণ দিতে গেলে তা খুবই ক্লান্তিকর আর দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তবে একটি বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা বলতে হবে। বস্তুত ১৯২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে পরমাণুর যোজ্যতা (valency) বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ছিল না। যোজ্যতার বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে এখনও যে সবকিছু জানা হয়ে গেছে, তাও নয়। অ্যাটমের গঠন সম্বন্ধে ঠিক ধারণা এল নিল্‌স্ বোর (Bohr) এর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কাজের পরে। এর আগে যোজ্যতার হিসেব মোটামুটি রসায়নবিদেরা দিতেন,—পরমাণুটি কতগুলি 'হাইড্রোজেন' পরমাণু সংলগ্ন করে নিতে পারে,—এই রকম ভাবে। কিন্তু কি কারণে 'যোজ্যতা'র অস্তিত্ব, পরমাণুর প্রকৃত গঠন আবিষ্কারের আগে সে বিষয়ে ভৌতবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান ছিল না। পারমাণবিক গঠন আবিষ্কার হওয়ার পরে তবেই ইলেকট্রনের ধর্ম-নির্ভর যোজ্যতার স্বরূপ বোঝা গেল ; বোঝা গেল—কেন বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে জ্ঞানের পুষ্টি ঘটবার অনেক আগেই দেখি প্রফুল্লচন্দ্র গোল্ড, প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়ম ধাতুর বিভিন্ন 'যোজ্যতা' নির্ণয় করবার জন্যে দীর্ঘ গবেষণার সূত্রপাত করেছেন। তিনি

প্ল্যাটিনামের এমন কতকগুলি যৌগ সৃষ্টি করতে পারলেন (যেমন,— $Pt\text{-}(S\text{-}C_2H_4\text{-}SH)_{1,\ 2,\ 3,\ 4\cdots 8}$) যাতে বোঝা গেল, পরীক্ষার অবস্থার ওপরে নির্ভর ক'রে প্ল্যাটিনাম ১, ২, ৩ বা, এমন কি ৮ পর্যন্ত যোজ্যতা ধারণ করতে পারে। দীর্ঘ ও অসাধারণ গবেষণার ফলে ঐ অদ্ভুত গঠনের সব কয়টি জটিল (complex) অণু তিনি সংশ্লেষিত (synthesize) করতে পারলেন। তিনি প্রমাণ করলেন, মারক্যাপ্-টান-সংক্রান্ত অণুখণ্ড (radical) গোল্ড (Au) পরমাণুর সঙ্গে এমন কতকগুলি যৌগ তৈরি করে যাতে প্রমাণিত হয়, অবস্থা বিশেষে Au-পরমাণুর যোজ্যতা ২, ৩, ৪, এমন কি ৫ ও হয়। ৫-যোজ্যতা-যুক্ত $(C_2H_4S_2)_5Au_2$ যৌগ তিনি গঠন করলেন। ইরিডিয়ম ধাতু নিয়েও প্রফুল্লচন্দ্র ঐ ধরনের গবেষণা করেছিলেন। $Ir\text{-}Cl_2(3C_2H_4)_2S$-অণুটির দু'টি সমমাত্রিক (isomeric) গঠন তিনি পেলেন।

তাঁর গবেষণাকালের শেষের দিকে তিনি fluoro-যৌগ নিয়ে বহু কাজ করেছেন ; যে যৌগগুলি acrylic জাতের প্ল্যাষ্টিক সৃষ্টির সাফল্যের পরে, ফ্লোরিনযুক্ত teflon বা PTFE নামের যৌগ হিসেবে বর্তমানে প্রায় শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে। ইথাইল, মিথাইল— fluoroformate, fluoroacetone, fluoroacetal ইত্যাদি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন,—যা বর্তমানের fluorocarbon-শিল্পের আদি যুগের উল্লেখযোগ্য কাজ।

একজন প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদের সমস্ত গবেগণার বিবরণ দিতে হলে তা নীরস প্রবন্ধের চেহারা নেবে। সেজন্যে রসায়ন-গবেষণার বিষয়ে বেশি কিছু আর বলা যাবে না। এখানে আমরা তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করাবার পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কি বলেছেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে আপাতত এ বিষয়ে ছেদ টানব। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে গবেষণা চালাবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়, ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-

কলেজে গবেষণা চালাবার জন্যে 'ইম্পিরিয়্যাল'-গ্র্যান্ট বা অনুদান হিসেবে দেওয়া হত মাত্র ১২০০০ টাকা,—অর্থাৎ মাসে বরাদ্দ মাত্র ১০০০ টাকা। এই অবস্থায় ল্যাবরেটরিতে কোনরকম ফেলাছড়া বা অযৌক্তিক খরচ সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা স্কটল্যাণ্ডে এবং 'স্কটিশ' লোকেদের কৃপণ হিসেবে খুবই খ্যাতি। প্রফুল্লচন্দ্রও মিত-ব্যয়িতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ লিখছেন,—"জুনিয়র ছাত্র হিসেবে মাষ্টারমশাই-এর ও সিনিয়র রিসার্চ স্কলার ছাত্রদের কাজকর্ম ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখতুম। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গরমের ছুটির মধ্যে ল্যাবরেটরিতে পুরোদমে গবেষণার কাজ চলছে। আমি করিডোরের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখছি; মাষ্টারমশাই ধরে ফেললেন। তক্ষুণি ল্যাবরেটরিতে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন সন্তুষ্ট হলেন তখন আমাকে একটা কাজ দিলেন। ল্যাবরেটরিতে অনেকগুলি বোতল ভর্তি নানাবিধ তলানি (residue) তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন, যার মধ্যে সিলভার-সংক্রান্ত লবণের তলানি ছিল। তিনি সেগুলি থেকে আমাকে সিলভার (রূপো) উদ্ধার করতে বললেন। রাসায়নিক পদ্ধতিতে তা থেকে উদ্ধার করা খাঁটি রূপোর ধাতব টুকরোটি (ingot) তাঁকে দেওয়া মাত্র তিনি সেটি ওজন করে আমায় বললেন, কত টাকা আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি। তারপর আমাকে কাজ দিলেন, ঐ খাঁটি রূপোকে সিলভার নাইট্রেট কেলাসে রূপান্তরিত করে সংগ্রহ করে রাখবার। আমার মনে আছে এভাবে বেশ কয়েক পাউণ্ড বিশুদ্ধ সিলভার নাইট্রেট পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে গোল্ড ও প্ল্যাটিনাম যুক্ত লবণের তলানি নিয়ে একই কাজ করেছি। সিলভার আয়োডাইডের তলানি থেকে বিশুদ্ধ আয়োডিনও উদ্ধার করতে হয়েছে। কোন ছাত্রেরই হুকুম ছিল না কোন দ্রবণের তলানি ফেলে দেবার। সবই বোতলে জমান হত। জুনিয়র ছাত্রদের তা থেকে খাঁটি ধাতু বা রসায়নটি উদ্ধারের কাজ দিতেন,—তাদেরও ট্রেনিং হত, ল্যাবরেটরির খরচাও কমত।"

জীবনের প্রায় শেষাবধি তিনি নিজের হাতে ল্যাবরেটরিতে

কাজ করেছেন। তাঁর হাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপায়ে গ্যাস-বিশ্লেষণ দেখবার মত ছিল।

॥ একটি মূল্যায়নের চেষ্টা ॥

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতেই বলেছি, প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকৃতি অনেক সময়েই তাঁর প্রভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজের বৃহত্তর প্রচ্ছায়ার মধ্যে দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গেছে। তাঁর গবেষণার ব্যাপারটি দেখলে প্রথমেই মনে হবে,—তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভিন্ন নাইট্রাইট যৌগ তৈরি আর তাদের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করতেই সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁকে Master of Nitrites উপাধিতে সস্নেহে ভূষিত করেছিলেন হেনরি আর্মস্ট্রং (H. E. Armstrong)। তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেকেই শুধু বলেছেন যে তিনি এদেশীয় বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিয়ে একটি শক্তিশালী রাসায়নিক গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছিলেন, (যাকে ইংরেজিতে বলে School)। অমিতাভ সেন[১] লিখেছেন,—In assessing the scientific contributions of P. C. Ray in the light of present day knowledge it has to be stressed that his researches should be judged by the standard of his time and the research facilities and funds he was able to get.

প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বলতে গিয়ে বেশির ভাগ জীবনীকারই যেন কিছুটা কুণ্ঠাভরে বলতে চেয়েছেন যে তিনি ভারতে প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদ্ গোষ্ঠির (School) সৃষ্টিকর্তা মাত্র। তিনি এ বিষয়ে সত্যকারের 'আচার্যের' কাজ করেছেন। হেনরি আর্মস্ট্রং (Essays on the Teaching of Scientific

১। Acharya Prafulla Chandra Ray, Some Aspects of his Life and Work ; Ed. Santimoy Chatterjee and Amitava Sen, —Indian Science News Association, পৃ: 60

Methods'-বই-এর লেখক, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক) আরও বিশদ ভাবে[১] বলেছেন, (অনুবাদ)—"তাঁর প্রথম শিক্ষক, Pedler, নিজে খুব 'প্র্যাকৃটিক্যাল' জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। Crum Brown (তাঁর এডিনবরার শিক্ষক) তাঁর মানসিক গঠনের ওপরে হয়ত কিছুটা দার্শনিকতার ছায়াপাত ঘটিয়েছিলেন। রসায়নশাস্ত্রকে একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের মত 'যথাবিহিত তথা কর্তব্যম' এর গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে 'পরীক্ষা করলে দেখা যাবে', এমন অটল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করবার সময় তখনও আসেনি (অর্থাৎ—রায়ের বিদেশে শিক্ষাকালে)। সুতরাং বর্তমানকালের যে সব রসায়নবিদ্ তত্ত্বীয় যুক্তি-চিন্তার ওপরে নির্ভরশীল, রায় তাঁদের মত ছিলেন না, ছিলেন খুঁতখুঁতে,, 'হাতে-কলমে না করে মেনে না নেওয়া' গোষ্ঠির অস্তিত্বকালের অন্তিম লগ্নের এক নবাগন্তক।" আর্মস্ট্রং আরও বিবরণ দিচ্ছেন,—যখন প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা ছাড়লেন, তখনও কেমিস্ট্রির ইলেকট্রন তত্ত্ব-নির্ভর থিওরি'র বহু কিছুই স্বীকৃত হয়নি,—যেমন Arrhenius'-এর Electrolytic Dissociation Hypothesis বা Ostwald বা Vant Hoff-এর কার্যাবলী। প্রফুল্লচন্দ্র Co-ordinate যৌগ নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু এরকম সংযুতির কারণ যে অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ও গ্রুপের মধ্যে covalent-linkage এর দরুন ইলেকট্রনের আদান-প্রদান,—এ সব তত্ত্বের প্রাঞ্জলতা তাঁর শিক্ষার মধ্যে কখনও পরিস্ফুট হয়নি। তিনি পুরনো ধরনের রসায়নবিদ্ই রয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এ'টাই সব কথা নয়। কত বিভিন্ন দিকে তাঁর গবেষণা পরিচালিত হত, তাঁর বিভিন্ন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর যৌথ পেপারগুলি দেখলেই তা চোখে পড়ে। নীলরতন ধর মৃত্তিকা-রসায়ন বিষয়ে কাজ শুরু করলেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মোটামুটি ভৌত রসায়নতত্ত্ব ও ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির দিকে আকৃষ্ট হলেন ও গুরুর সঙ্গেই এ বিষয়ের

১। Henry E. Armstrong, Sir P. C. Ray 70th Birthday Commemoration volume.

কাজের গোড়াপত্তন করলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কোলয়েড-কেমিস্ট্রির (colloid chemistry) কাজের ভিত্তি স্থাপন করলেন। উনি পরে বিখ্যাত রসায়নবিদ্ F. G. Donnan এর সঙ্গে electrical theory of colloids বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,—এই বিশিষ্ট ছাত্রদের তিনি সস্নেহ গর্বভরে 'জ্ঞানত্রয়' নামে উল্লেখ করতেন। পুলিনবিহারী সরকার Rare Earth গোষ্ঠির ধাতুর রসায়নতত্ত্ব নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তিনি পরে ফরাসীদেশে Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন গবেষণা করেছেন ঐ বিষয়ে। প্রিয়দারঞ্জন রায় জটিল যৌগ নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের রসায়নতত্ত্ব বা radio-chemistry'র ওপরেও তাঁর গবেষণা ছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজে অজৈব রসায়নে বিশেষজ্ঞ হলেও তাঁর নির্দেশনায় জৈবরসায়নের বিশেষ শক্তিশালী গোষ্ঠিও গড়ে ওঠে। বীরেশচন্দ্র গুহ খাদ্য-রসায়ন ও সাধারণভাবে Biochemistry বা জীবরসায়নবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। হেমেন্দ্রকুমার সেন ও প্রফুল্লকুমার বসু লাক্ষা বিষয়ের বিশেষ রাসায়নিক চর্চা শুরু করেন ও দুজনেই পর পর রাঁচির কেন্দ্রীয় লাক্ষা গবেষণাগারের অধিকর্তা হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় তাঁর শিক্ষায় মানুষ হয়ে পরে ম্যাঞ্চেষ্টারে রবিনসনের কাছে 'অ্যাল্‌কালয়েড' সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চমানের গবেষণা করেন। দেশে ফিরে পরে তিনি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈবরসায়নের বিভাগীয় অধ্যাপক হন।

বীরেশচন্দ্র গুহ ১৯২৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের ল্যাবরেটরিতে প্রথম যোগ দেন। পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান বায়োকেমিস্ট্রির কাজ করবার জন্যে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের ঘোষ প্রফেসর হয়ে বায়ো-কেমিস্ট্রি বিভাগের পত্তন করেন।

ভৌত রসায়ন তত্ত্ব বা Physical Chemistry বিষয়টি গড়ে উঠল প্রায় প্রফুল্লচন্দ্রের চোখের সামনে। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রথম থেকেই এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যাপকের সঙ্গে একত্রে জ্ঞানচন্দ্র ও মাণিকলাল দে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে Velocity of

decomposition and dissociation constant of nitrous acid নামের পেপার ছাপালেন। জ্ঞানচন্দ্র পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাজ,—Theory of Strong Electrolytes—গড়ে তোলেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে তিনি photochemistry (আলোর বিক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন) ও নানা নতুন অন্যান্য বিভাগ যেমন—কৃষি-রসায়ন বিদ্যা (agricultural chemistry) ইত্যাদি গড়ে তোলেন। তিনি পরবর্তীকালে দেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষাবিদ্ হিসেবে খ্যাতনামা হন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি 'কোলয়েড কেমিস্ট্রি'র বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হলেন, তিনি মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বা soil science-এ এদেশের আদি বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরে ভারত সরকারের নানা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন,—দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার বা Indian Agricultural Research Institute-এর অধিকর্তা হন ; পরে Central Building Research Institute এরও অধ্যক্ষ হন।

আচার্যের অসংখ্য ছাত্রের সকলকার কৃতিত্বের কথা লিখতে গেলে একখানি বই-এর সাধারণ কলেবরের মধ্যে তা বলা সম্ভব হবে না।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, ১৮৯৬ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত, যখন রসায়নশাস্ত্রের নব নব দিগন্ত খুলে যাচ্ছে তখন প্রফুল্লচন্দ্র নিজে প্রায় ১৫ বছর ধরে কেবলমাত্র নাইট্রাইট যৌগ বিষয়েই গবেষণা চালিয়ে গেলেন কেন? এর একটি উত্তর অমিতাভ সেন দিয়েছেন,—The reasons might have been that P. C. Ray at that time was involved in other activities besides research... বিশেষতঃ, তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বৃহত্তম অবদান History of Hindu Chemistry রচনায়। Often it is forgotten that writing of this book alone was probably an equally if not more, important research work in the laboratory...।

১০

॥ বিজ্ঞান কলেজের সেই বাসিন্দাটি ॥

বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ দিকের দোতলার লম্বা বারান্দার সামনের একটি ঘর। সেই ঘরে বাসা বেঁধেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। একা মানুষ, কিন্তু একা নয়। তাঁর সঙ্গে থাকে বেশ কয়েকজন ছাত্র, যাদের কলকাতায় থাকবার মত সঙ্গতি নেই। সেই মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার বিজ্ঞান-গবেষণার কাজ চলে তাঁর।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-কৃতিত্ব আর তাঁর শিক্ষকতার অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তখনকার ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'নাইটহুড' (Knighthood) দান করল, তিনি এবার থেকে হলেন 'স্যার' পি. সি. রায়।

কিন্তু কি অসাধারণ কষ্ট তাঁর মনোমত গবেষণা পরিচালনা করবার! প্রধানতঃ টাকার অভাব। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতার ফলে স্যার আশুতোষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পালিত ও ঘোষ দুজনেরই দানপত্র অনুযায়ী তাঁদের দেওয়া টাকার সুদ থেকে শুধুমাত্র দুই অধ্যাপক ও তাঁদের গবেষক ছাত্র বা Scholar-দের মাসিক বেতন ও মাসোহারা দেওয়া সম্ভব ছিল। সেই অর্থ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কেনা, গবেষণা চালাবার অন্যান্য খরচ, বা ল্যাবরেটরির প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি তৈরির কাজে খরচ করা চলত' না। তাহলে কাজ চালাবার মত টাকা কোথা থেকে আসবে? বিজ্ঞান কলেজের মূল বাড়ি না হয় তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 'ফী' এর জমান টাকা থেকে। তারপর?

এখানেই আসে সরকারী সাহায্যের কথা। স্যার আশুতোষের একান্ত চেষ্টাতেও যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজকে সরকার কিছুতেই টাকা দেন না, কিন্তু যথেষ্টরও বেশি টাকা তাঁরা দিচ্ছেন বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স'কে, অথবা বোম্বাই-এর তদানীন্তন 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশন অব সায়েন্স'কে। বোঝা গেল, পালিত ও ঘোষ 'এনডাউমেণ্টের' (endowment) যে শর্ত, যথা,—'ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ ছাড়া অন্যদেশীয়রা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক হতে পারবেন না'—সেই শর্তের ব্যাপারটি ইংরেজ সরকারের পছন্দ নয়। স্বাদেশিকতার কোনরকম প্রকাশই ভারতীয়দের মধ্যে দেখলে ইংরেজ প্রভুরা বিরক্ত হন ! তাই সরকারী সাহায্য আসে না বিজ্ঞান কলেজে। সুতরাং যৎসামান্য টাকায় বিজ্ঞানের গবেষণা চলে এখানে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সেজন্যে দমবার পাত্র নন। তাঁর ছাত্রদল সবরকমের কৃচ্ছ সাধন করতে প্রস্তুত।

কোন রকম অপচয় বা অমিতব্যয়িতা না ঘটে; সেদিকে প্রফুল্ল-চন্দ্রের অতিশয় সজাগ দৃষ্টি থাকত। প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৃপণ 'স্কট'দের দেশ এডিনবরায় তিনি অনেকদিন কাটিয়েছেন। তাদের চরিত্রের মিতব্যয়িতা তিনি নিজের মধ্যেও গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন, (অনুবাদ)—"যদি কোন ছাত্র দরকারের চেয়ে সামান্যতম বেশি 'রি-এজেণ্ট' খরচ করত তবে তাঁর চোখে পড়লে তার আর রক্ষা ছিল না। যদি কেউ জলের কল অপ্রয়োজনে খুলে রেখে দিত তবে তার কপালে ছিল দুঃখ। রিসার্চের কাজ চালাবার জন্যে যতরকমের কৃচ্ছ্র সাধন করা যায় তার কম্‌তি ছিল না।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত রাখছেন, প্রফুল্লচন্দ্র এর বিরুদ্ধে বারংবার সোচ্চার হয়েছেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—Whenever we approach the Government of India or that of Bengal we are told that there are no funds to spare.....I have had occasions to criticize the niggardly parsimony of

the Government. We are treated like so many Oliver Twists....I hope that the Government of India, or that of Bengal whichever it may be will now come forward and give us substantial help for the University College of Science. I have calculated that we have received only two percent help from the Government, whereas 98 percent have been contributed by our own people. অর্থাৎ (ব্রিটিশ) সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাথ বালক অলিভার টুইষ্টের মত অনাথ-আশ্রমের অনিচ্ছার দান যৎসামান্য আহার্য ছুঁড়ে দিচ্ছেন। বিজ্ঞান কলেজ চালাতে যে টাকার দরকার তার মাত্র শতকরা ২ ভাগ সরকারী তহবিল থেকে আসে আর ৯৮ ভাগ দেশের লোকদের দান থেকে।

বিজ্ঞান কলেজে তাঁর দৈনন্দিন রুটিন ছিল,—ভোর সাড়ে পাঁচটায় গাত্রোত্থান। তারপর পড়াশোনা—১ ঘণ্টা। তাঁর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন এই সকাল বেলায় শেক্‌স্‌পীয়ার পড়া। সামান্য কিছু জলযোগের পর ঠিক ন'টার সময় আসতেন ল্যাবরেটরিতে। এসে, ঘণ্টাখানেক চিঠিপত্র পড়া ও লেখাতে কাটাতেন। ঘড়ি ধরে দশটায় ল্যাবরেটরির কাজ শুরু হত। কিছু কিছু রিসার্চ স্কলার অবশ্য তার আগে থেকেই ল্যাবরেটরিতে কাজে লেগে যেত। ঠিক বেলা একটায় তিনি দুপুরের খাবারের জন্যে দোতলায় উঠে যেতেন। খাবার পরে কিছুটা বিশ্রাম। আবার নীচে চলে আসতেন। চারটে বাজবার পরে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। হয় যেতেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অথবা অন্য কোনও কারখানা বা কোম্পানীতে,—যার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তারপরে তাঁর ঘোড়ার গাড়ি তাঁকে হাজির করে দিত গড়ের মাঠে, তথাকথিত 'ময়দান ক্লাবে', যেখানে তখন জেনারেল রবার্টসের মূর্তি ছিল।

'ময়দান ক্লাব' সম্বন্ধে অনেকের বিচিত্র মধুর অভিজ্ঞতার কথা

লিখিত আছে[১]। "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সন্ধ্যাকালে গড়ের মাঠে যে আড্ডা ছিল—আড্ডা নহে, নৈমিষারণ্য—বহুকাল তাহার নগণ্য সভ্য থাকিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল।...সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেসের সেক্রেটারি এবং ক্যাশিয়ার শ্রদ্ধেয় সত্যানন্দ বসু, ঢাকা মালখানগরের জমিদার প্রফুল্লবাবু, সকলেই দিগ্‌গজ,—তাঁহারাও ঐ নৈমিষারণ্যের সভ্য ছিলেন...

"তাঁহার নৈমিষারণ্যে কোনও কথার আলোচনা বাকি থাকিত না। ছোট বড় গৃহস্থালির কথা হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মদর্শন পর্যন্ত।"

ময়দান ক্লাবের আরও সভ্য ছিলেন, যেমন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, "কেশরঞ্জন তৈল"-খ্যাত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ।

ময়দান ক্লাবের বৈঠকের আগে প্রায় আধ ঘণ্টা জোর পা ফেলে হাঁটাও ছিল নিত্যকর্তব্যর মধ্যে। রাত্রি ৯টায় রাত্রের খাবার ও নিদ্রা। একেবারে ঘড়ি ধরে দৈনন্দিন কাজগুলি চলত।

তাঁর সঙ্গে থাকত কয়েকজন বাছা বাছা ছাত্র। নীলরতন ধর পুরনো বেঙ্গল কেমিক্যালের বাড়ি থেকেই (৯১ নং আপার সার্কুলার রোড) তাঁর সঙ্গে থাকতেন। বিজ্ঞান কলেজে থাকতেন বীরেশ গুহ। আরও অনেকের নাম করা চলে, যেমন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার বসু, নদীয়াবিহারী অধিকারী, ভবেশচন্দ্র রায়, সুশীলকুমার মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ, —যাঁরা কোনও না কোনও পর্যায়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় অনেকের কথা বলেছেন, বলেছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। নদীয়াবিহারী অধিকারী দীর্ঘ ন'বছর প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে থেকেছেন। তিনিই আচার্যের এই বৃহৎ 'সংসারের' হিসাবপত্র রাখতেন। তিনি বলেছেন, সমস্ত রকমের খরচ খরচা, মায় আচার্যের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের গাড়িভাড়া প্রভৃতিও ধরে মাসিক

১। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০০ টাকার মধ্যে চালাতে হত। তাঁর পেনশনের পরিমাণ ছিল ৪৩০ টাকা, সুতরাং প্রতি মাসে উদবৃত্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হত। ঐ জমা টাকা আচার্যের দান ধ্যানে ব্যয় হত। তাঁর ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখলেন,—"আমার জীবনের বাকি দিনগুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক লইতে আমি অক্ষম। সেইজন্য আমার নিবেদন যে, পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরের রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

'বসুধারা' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৬৪) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন,—"জৈষ্ঠ মাস, সকাল থেকেই গুমট করে রয়েছে। সতীশ মিত্র এল; এসে বলল—আমি আচার্য প্রফুল্ল রায়কে কোনদিন কাছ থেকে দেখিনি, তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

বেরলুম দুজনে। তখন তিনি থাকেন সায়েন্স কলেজের দোতলার দক্ষিণ দিকের এক ঘরে। তিনি ঘরেই ছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ঘর থেকে বেরলুম।

বাইরে এসে সতীশ বলল,—ওঁর ঘরে পাখা নেই দেখলুম। আমি আজ দুপুরে ওঁর ঘরে একখানা পাখা টাঙ্গিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

—দাঁড়াও, ওঁর অনুমতিটা নিই।

আবার দুজনে ঘরে ঢুকলুম। সতীশের প্রস্তাবটা বললুম।

গুম্ করে আমার পিঠের ওপর একটা কিল পড়ল।

দরজাটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন,—এটা কোন দিক?

—কেন, দক্ষিণ দিক।

—তবে?

এই "তবে" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে

রইলুম। বললেন,—প্রচুর হাওয়া আসে ঘরে, পাখার কোন দরকার নেই।

হতবাক্ হয়ে যে যার বাড়ি ফিরলুম।”

চারুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই যে এই কৃচ্ছ্রসাধনের কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় কমানর অনলস প্রচেষ্টা।

ভবেশচন্দ্র রায় লিখছেন[১]—“তিনি নিজে চিরকুমার। কিন্তু তাঁর কাছে সব সময় আমার মত আট দশটি ছেলে থাকত। তারা আচার্যদেবের কাছেই থাকত, তাঁর ওখানেই খেত, আর বিজ্ঞান কলেজের ঘরে যার যার নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে আচার্যদেব প্রত্যেকের কাছে যেয়ে খোঁজ নিতেন কে কি করছে, কার কি অসুবিধা, এই সব। হয়ত কোন যন্ত্রপাতির অভাবে কাজ-কর্মে অসুবিধা হচ্ছে, একবার কোনমতে কথাটা তাঁর কানে তুলতে পারলেই হ’ল। ব্যস, যেখান থেকে হোক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কলেজ থেকে যদি সম্ভব না হয় নিজের পেন্‌শনের টাকা থেকে নিজেই দিতেন সে সব কিনে। এই ভাবে ছেলের-দল কাজ করে যেত। তাদের কাজ হয়ে যখন কোন কিছু ফল পাওয়া গেল তখন তাঁর কি আনন্দ, কি উল্লাস! যাকে পান তাকেই ডেকে বলবেন—“দেখ, অমুক এই কাজটা করেছে, কি খেটেছে”—ইত্যাদি।

বিজ্ঞান কলেজে তাঁর দৈনিক কাজকর্ম ও বিশ্রামের সময় কিভাবে অনড় নিয়মে বাঁধা থাকত তার এক বিবরণ দিয়েছেন জ্ঞান রায়ঃ His daily routine would begin at 5-30 A. M. and he would devote an hour or so to his study. He used to read Shakespeare daily at this time. After a very frugal meal he would be in the laboratory before nine and then spend an hour or so to attend

---

১। শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

to his correspondence. The work in the laboratory used to begin at 10 A. M. Some of the research students would be working before then. After 4 P.M. he would leave the laboratory to visit the Bengal Chemical or some other organisation with which he was connected. After a relaxation for an hour or so at the Maidan Club he would take a sparing meal on returning home and retire for the night. এর পরের অংশটুকুর বাংলা তর্জমা দিচ্ছি : "রবিবারে রবিবারে তাঁর কাছে বাইরের দর্শনার্থী আসতেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য পেতেন। আমার ওপরে নির্দেশ ছিল এই সব দর্শনার্থীদের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার নেওয়া, তেমন বুঝলে কাউকে কাউকে নিজেই বিদায় করে দেওয়া। এক রবিবার, যখন প্রায় ১টা বাজে, তখন এক ভদ্রলোক এসে ভেতরে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, এখন আচার্যদেবের দুপুরের খাবার সময়, এখন তিনি যেন ভেতরে না যান। ভদ্রলোক বললেন তিনি আচার্যদেবের মামাতো ভাই। আমি ভাবলাম, তাহলে তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ফলে, পরে আচার্যদেব আমার ওপরে মহা ক্ষাপ্পা হয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমায় বলতে হল আমার অসুবিধের কথা। বললাম— 'উনি হলেন আপনার মামাতো ভাই।' তিনি জবাব দিলেন,— 'মামাতো ভাই তো কি হয়েছে? 'বাবাতো' ভাইয়ের জন্যেও আমার রুটিন আমি ভাঙ্গবো না।'

তাঁর প্রতিদিনের খাবার অনেক সময়ে ছেলেরাই পালা করে তৈরি করত। কখনও বা নিজেই হাত লাগাতেন তিনি। অবশ্য একটি কাজের লোক ছিল এবং তার কাজের, মধ্যে পাক করার ও অন্য যাবতীয় কাজই হিসেব মত ছিল। "আচার্যদেবের সংসারে যে ছেলেরা থাকতো তাদের তিনি রীতিমত সংসারের কাজ করতে বাধ্য করতেন। কাউকে বা ঘর ঝাঁট দিতে হত, কেউ পাক

করতো। কেউ বা পরিবেশন করতো। নিজে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাপড় কাচতেন, নিজে মেলে দিতেন, আবার নিজেই সেটা যথা সময়ে গুছিয়ে তুলে রাখতেন। কোনদিন এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি।...তিনি এম. এ., এম. এস. সি. পাশ ছেলেদের সংসারের কাজ শেখাতেন, ঠিক যেমন করে মা সংসারের বড় বয়স্থা মেয়েদের কাজ শেখান" (ভবেশচন্দ্র রায়)।

॥ ১৯২০—১৯৩৬ ॥

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স ৬০ বছর হল। আমরা একটু আগেই বলেছি, ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দিলেন যে পালিত প্রফেসারের বেতন এবার থেকে তিনি আর নেবেন না, ঐ টাকা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করছেন, রসায়ন বিভাগের উন্নতির জন্যে তা খরচ করবার অধিকার দিয়ে। ঐ টাকা থেকে মাসিক ২০০ টাকা ভাতায় দু'টি রিসার্চ ফেলোশিপও তৈরি হল। এর পরে যতদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করেছেন তা হিসেব করলে তাঁর এই দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,০০০ টাকা; এছাড়া ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরও ১০,০০০ টাকা দান করলেন প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ নাগার্জুনের নামে একটি বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের জন্যে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়, সকলেই তাঁকে D. Sc. উপাধি দিয়ে নিজেদেরই সম্মানিত মনে করলেন। জার্মানীর মিউনিখ শহরের Deutsche Akademie of Munich তাঁকে সাম্মানিক Fellow হিসেবে মনোনীত করল। লণ্ডনের Chemical Society ১৯৩৪ সালে তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হল Indian Chemical Society'র। তিনি হলেন প্রথম সভাপতি। পরেও ফের

পুনর্নির্বাচিত হলেন আর এক দফার (টার্মের) জন্যে। কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁর সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বললেন,—More than 40 years ago, while a student at Edinburgh, I almost dreamt a dream that, God willing, a time would come when modern India would also be in a position to contribute her quota to the world's stock of scientific knowledge and it has been my good fortune to see my dream materialize.

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত National Institute of Science (যা এখন Indian National Science Academy নামে বিখ্যাত) তাঁকে সাম্মানিক Foundation Fellow হিসেবে বরণ করে। ঐ বছরই তিনি মেঘনাদ সাহা, দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে মিলে Indian Science News Association গড়েন।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ গর্বের বিষয় ছিল যে তাঁর জীবিত কালেই ভারতের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন তাঁরই ছাত্ররা। কৃতি ছাত্রদের কাজের বিষয়ে তিনি নিজেই বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর একান্ত অহঙ্কারের বস্তু। ১৯২৮ সালে তিনি লিখছেন,—I need not pursue further my account of our Institution which has passed the stage of apron strings and has just stepped into teens. My young colleague Raman is a host in himself. Suffice it to say that if this temple of science had produced just one Raman and nothing else it will have amply justified the expectation formed by its Founder who, alas, is no longer in the land of the living ;—"এই বললেই যথেষ্ট

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan. Bengal

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
সত্তর বছর বয়সের
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে
কবির এই অভিনন্দন।

আমরা দুজনে সহযাত্রী।
কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি।
কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।
আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,— কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি,

বেশি শক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। দুই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবেনা। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আগষ্ট
১৯৩২

হবে যে যদি এই বিজ্ঞান মন্দির মাত্র একজন রামনকে সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই না করত, তবুও এর পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ মর্যাদা এ রক্ষা করত।" এ রচনা রামনের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হল। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে অভূতপূর্বভাবে সম্বর্ধনা জানাল। এ বিষয়ে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ তুলে দেবার লোভ সামলান গেল না।

"আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হল ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ সাল। স্থান—টাউন হল।

জয়ন্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন নীলরতন সরকার; সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন—

'আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিনন্দন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত, অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞান-তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।'

এই জয়ন্তী উপলক্ষ্যে চাঁদা উঠেছিল প্রায় সতের হাজার টাকা। আর খরচ হয়েছিল একশ সাতচল্লিশ টাকা। চিঠির কাগজ, হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টার প্রভৃতির জন্য কাগজ বিক্রেতারা কাগজ দিয়েছিলেন অমনি। ছাপাখানা অমনি ছেপেছিল। যাঁরা চাঁদা আদায় করতে বেরুতেন তাঁরা ট্রামভাড়া নিজের গ্যাঁট থেকে দিতেন। বিশেষ কারণে মোটর দরকার হলে এক ভদ্রলোক পেট্রল সমেত তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। হিসাব-রক্ষক পয়সা নিতেন না। রোজ সন্ধ্যায় এসে খেটে দিয়ে যেতেন। অনুষ্ঠানের দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ফুল-ওয়ালারা বিনা পয়সায় ফুল দিয়েছিল। অক্সিজেন-সিলিণ্ডার অমনি পাওয়া গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা নিজ নিজ পয়সায় চা খেয়ে আসত। সেদিন ছুটাছুটি করবার জন্যে চারখানি মোটরের জোগাড় হয়েছিল। দরওয়ানরা বক্‌শিশ নিলে না।

সরকার কানমলে স্ট্যাম্প ও টেলিগ্রামের খরচ নিল। করপোরেশন টাউন হল ভাড়া মকুব করতে পারল না। তাদের আইনে আটকায়। এই দুই বাবদ নগদ যে একশ সাতচল্লিশ টাকা খরচ হল তা উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনজন দিয়ে দিলেন। বহু মনীষীর রচনায় সমৃদ্ধ এক স্মারক-গ্রন্থ আচার্যদেবকে উপহার দেওয়া হল; তার প্রকাশের সমস্ত খরচ বহন করলেন একজন ধনী বিজ্ঞানী।

আদায়ী সতের হাজার টাকা পুরো মজুত রইল। তা বেড়ে আজ পঁচিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কাগজ কিনে সরকারের হেফাজতে রাখা আছে। সুদ যা আসে দরিদ্র ছাত্রদের মাইনে দিতে, বই কিনতে দেওয়া হয়। একটি পরিচালক কমিটি আছে।"

যে স্মারক-গ্রন্থটি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হল সেটির সম্পাদনা করেছিলেন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে একটি 'বোর্ড', যার সদস্য ছিলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যচরণ লাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আচার্য রায় সম্বন্ধে এটিতে লিখেছেন Dr. Henry Armstrong (The Future of Chemistry in India), বিধুশেখর ভট্টাচার্য, (প্রফুল্ল

প্রশস্তি), জগদীশচন্দ্র বসু (Appreciation), মানকুমারী বসু (অভিনন্দন), স্যার এ. সি. চ্যাটার্জী (Appreciation), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়), প্রমথ চৌধুরী (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র), প্রিয়ম্বদা দেবী (অভিনন্দন), Dr. Donnan (Sir P. C. Ray, man and his work), Dr. M. O. Forster (A Human Personality), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (Tribute to Acharya Ray), রায়বাহাদুর হীরালাল (Dr. Sir. P. C. Ray—The real man), ডঃ এস. কে. মৈত্র (Dr. P. C. Ray, The Dedicated Life), ডি. পি. খৈতান (Appreciation), Dr. A. R. Normand (Appreciation), কবিশেখর কালিদাস রায় (প্রফুল্ল প্রশস্তি), প্রিন্সিপ্যাল বি. এম. সেন (From his old College), Dr. J. L. Simonsen (Appreciation), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহজ মানুষকে নমস্কার), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আচার্য ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়) এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ (কবির অভিনন্দন)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন,—He still works in his laboratory generally from 9 A.M. to 4 P.M. with an hour's interval for meal and rest and knows no other respite even on all holidays save the summer vacation. Thus Science still is and has been for the last 45 years or more his preoccupation. Not that Science his only occupation. Far from it......... Shakespeare "who saw life steadily and saw it whole" speaks of a man of genius (one of his own immortal creation) as not merely a wit himself but the cause of wit in others. By his genius and application Dr. Ray has not only been holding

the torch of Chemical science in India but has been able to light the flame in kindred hearts...

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন,—

"...উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বললেন আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হোত না। ......"আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

জগদীশচন্দ্র লিখলেন— ...He was one of the first to realise the importance of Indian industries for the economic advancement of the country. With the object in view he risked the very little he possessed; and the venture started in this modest way has now grown into perhaps the most successful chemical industry in the whole of India···others have also profited by his self-denial. He has wanted little and kept even less for himself, the rest being given away to poor students and in charities. The association of plain living and high thinking is always very rare; in addition to these there is in Sir P. C. Ray the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country

and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Henry Armstrong একটি আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র এবং ভারতবর্ষের কলিত রসায়নের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ঐ গ্রন্থে।

বিশাল ৬১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থটিতে আরও বহু বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ রয়েছে।

১১

॥ বেঙ্গল কেমিক্যাল ও তার হৃতমান প্রতিষ্ঠাতা ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদে বেঙ্গল কেমিক্যালের পত্তন ও তার ইতিহাস বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে কারখানা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মানিকতলা (বাগমারিতে) খালের কাছে। এর জন্যে ১০ বিঘার একটি জমি কেনা হল ১৯০৫ সালে। প্রথম সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যাণ্ট চালু হল ১৯০৭ সালে। কারখানা এখানে আসবার আগেই ১৯০৪ সালে রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন। রাজশেখর প্রফুল্লচন্দ্রেরই ছাত্র, ১৯০৩ সালে রসায়নে এম. এ. পাশ করেন তিনি। বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনি হলেন ম্যানেজার। রাজশেখর বসুর মধ্যে ছিল নীরব নিষ্ঠা, অদম্য কর্মক্ষমতা, অটল শৃঙ্খলাবোধ ও অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। আপাত গম্ভীর, ন্যায় ও নীতিপরায়ণ ম্যানেজার রাজশেখর বসুর অন্য আর একটি মুখ—হাস্যমুখর, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকার সাহিত্যিক 'পরশুরাম'। যতদিন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে ছিলেন, কোম্পানীর কাজে শৃঙ্খলা ও শ্রীবৃদ্ধির অভাব হয় নি। উনি অবসর নেন ১৯৩৩ সালে,—'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' হিসেবে কাজ করেছিলেন তখন।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন ফ্যাক্টরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ১৯২৫ সালে তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজির খাদি আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি সোদপুরে গান্ধী-আশ্রমের পত্তন করেন (খাদি-আশ্রম)।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পেরেছিল। সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা বাড়ল। 'ফায়ার-এক্স্‌টিংগুইসার' বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের একটা মোটারকমের অর্ডার পেল কোম্পানী। এই প্রথম ভারতবর্ষের কোন কারখানায় চা-পাতার গুঁড়ো থেকে 'ক্যাফেন' (caffeine) নামের ঔষধ তৈরি

হল। বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় রাসায়নিক তুলা (Chemical balance) প্রথম তৈরি হল। যুদ্ধের কাজের জন্যে যথেষ্ট তুলো-গজ-ব্যাণ্ডেজের অর্ডারও এল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ যেই হল, সরকার এ ধরনের ছোট কারখানাকে অর্ডার দেওয়ার বদান্যতা ত্যাগ করলেন। ইংরেজ তাদের নিজের দেশে যুদ্ধের আগে যে সব রাসায়নিক বস্তু তৈরি করা দরকার মনে করত না (কারণ আমদানীই শস্তা পড়ত), এখন যুদ্ধের সময়ে বিপদে পড়ার শিক্ষা থেকে দেশেই সে সব রাসায়নিক তৈরি শুরু করল। আমদানী বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে মোটা শুল্ক চাপাল বিদেশী জিনিসে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম চালু করল না। ফলে দেশী শিল্প, যার গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল, বিলেতি আমদানী জিনিসের সঙ্গে লড়াই করে সেই সম্ভাবনাকে দাঁড় করাতে পারল না প্রায় কোন ক্ষেত্রেই। তবুও বেঙ্গল কেমিক্যাল বেড়ে উঠতে লাগল। পানিহাটিতে নতুন একটি কারখানা খোলা হল ১৩৩ বিঘা জমির ওপরে। আলকাতরার পাতনের প্রক্রিয়া চালু করে B.C.P.W. অজস্রবিধ অজৈব রাসায়নিক বস্তু, রং ইত্যাদি, নানাবিধ ওষুধ তৈরি করতে লাগল। বিপুল পরিমাণে ফট্‌কিরি তৈরি শুরু হল। এই সঙ্গে শুরু হল জৈব রাসায়নিক বস্তু তৈরি। সেরাম ও নানা অসুখের প্রতিরোধী টীকা তৈরি করা হতে লাগল। ১৯৩১ সালে নতুন ডিজাইনের বিপুল সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট খাড়া হল। ১৯৩৭ সালে আচার্যের নামে 'স্যার প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগার' স্থাপন করা হল। ১৯৪১ সালে কন্‌ট্যাক্ট্‌-পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি শুরু হল; ১৯৩৪ সালে বোম্বাইতে বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি শাখা কারখানা খোলা হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঙ্গল কেমিক্যালের সামনে আরও বেড়ে ওঠবার সুযোগ এনে দিল। ক্লোরোফর্ম, ইথার, স্যাণ্টোনিন, গ্যালিক অ্যাসিড, ট্যানিক অ্যাসিড, পারম্যাঙ্গানেট, ডাইক্রোমেট ইত্যাদির প্রচুর সরকারী অর্ডার এল। পাঞ্জাবেও একটি কারখানা খোলা হল।

কিভাবে টাকার অঙ্কে ব্যবসা বেড়েছিল তার একটা হিসেব আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদে দিয়েছি। এখানে আবার বলি, প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বছরে বিক্রির পরিমাণ ছিল দেড় কোটি টাকা।

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি অন্য মূল্য ছিল, তা হল বাঙ্গালী তথা ভারতীয়ের আত্মনির্ভরতা আর আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে। কথিত আছে, পরিণত বয়সেও যখনই তিনি কলকাতার বাইরের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতেন, তিনি সেই শহরে বেঙ্গল কেমিক্যালের এজেন্টদের বা বেঙ্গল কেমিক্যালের জিনিস যারা বিক্রি করত তাদের সঙ্গে দেখা করতে কখনও ভুলতেন না। বেঙ্গলের জিনিস বিক্রি করতে তাদের কি অসুবিধে, সর্বদা তার খোঁজ রাখতেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল তখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, তিনি অন্যান্য ডিরেক্টরদের মতই একজন ডিরেক্টর মাত্র,—এ চিন্তা কখনই তিনি করেন নি। ১৯৩৪ সালে পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। সে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করে পণ্য সৃষ্টির নতুন উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত, সেজন্যে নতুন গবেষণার পিছনে অর্থ ব্যয়ে তিনি কাতর নন। কিন্তু এ ব্যাপারে ক্রমেই অন্য ডিরেক্টর ও অংশীদারদের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ হতে লাগল। অন্য অংশীদাররা ততদিনে প্রচুর লাভের টাকার মুখ দেখেছেন। তাঁরা ক্রমশ বেশি বেশি ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ব্যবসায়ে যে দুর্দিন আসতে পারে, পণ্যের চাহিদা কমতে পারে, দেশের অন্যত্র প্রতিযোগীর সৃষ্টি হতে পারে, এসব চিন্তা করে দুর্দিনের মোকাবিলা করবার জন্যে কোম্পানীর লাভের টাকার অংশ যে সরিয়ে নিয়ে মজুদ ভাণ্ডার বা রিজার্ভ ফাণ্ড গড়া একান্ত দরকার, সে সদিচ্ছার উদ্রেক প্রফুল্লচন্দ্র বারংবার বুঝিয়েও অন্য ডিরেক্টরদের মনে করিয়ে দিতে পারেন নি। অবস্থা এমন চরমে দাঁড়াল যে প্রফুল্লচন্দ্রকেই ডিরেক্টর-বোর্ড থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত চলতে লাগল, কারণ তিনি ডিভিডেণ্ট ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার প্রতিবাদ করছিলেন। তিনি ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা

করছিলেন যে প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকতে গেলে পণ্য সৃষ্টির নতুন নতুন দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু রিজার্ভ ফাণ্ড না থাকলে তার মূলধন আসবে কোথা থেকে?

১৯৩৯ সালের ১১ই জুলাই তিনি পরিচালক সমিতি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবার আগে একটি Note of Dissent (মত-পার্থক্যের বিবরণ) পাঠালেন[১], সেটির কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ এই রকম—

"আমি মতপার্থক্য জানিয়ে এই রিপোর্ট সই করছি। গত দু'বছরেরও বেশি কাল ধরে ডিরেক্টরদের—যাঁরা সবাই আমার সহকর্মী—বোঝাবার চেষ্টা করেছি ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ কমিয়ে দেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা; কিন্তু স্পষ্টতই আমি বোঝাতে পারিনি। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল অর্ধশতাব্দীকাল অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরাই প্রথম কিন্তু আমরা বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি আর ইতিমধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য লগ্নীকারকদের চেষ্টায় বেশ কয়েকটি রাসায়নিক শিল্প ব্যবসায় চতুর্দিকে জন্মলাভ করে আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। যে প্রতিযোগিতা আমাদের ভয় দেখাতে শুরু করেছে, আমাদের ম্যানেজার ইতিমধ্যেই তার সামনাসামনি হতে ভয় পাচ্ছেন। আমরা আমাদের পণ্যের গুণগত মান নীচু করতে পারি না, সুতরাং শারীর বিষয়ে কার্যকরী, একটা নির্দিষ্ট মানের (ওষুধ) পণ্য নিয়েই আমাদের প্রতিযোগিতার বাজারে থাকতে হবে। তারপর প্রত্যেক প্রদেশই তাদের নিজেদের রসায়ন ও ঔষধ শিল্প শুরু করবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে তারাই অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং অচিরেই আমাদের ভয়াবহ প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে।

---

(১) 'বেঙ্গল কেমিক্যাল লিঃ'র সৌজন্যে শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় Noteটি যথাযথ উদ্ধৃত করেছেন Indian Science News Association প্রকাশিত আচার্যের ১২৫ পূর্তির স্মারক গ্রন্থে।

"দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমাদের ডিরেক্টরদের একটা একগুঁয়েমি দাঁড়িয়ে গেছে যে শেয়ারহোল্ডারদের নির্দিষ্ট ও যথেষ্ট পরিমাণে ডিভিডেণ্ড দিয়ে যেতেই হবে। আর এইভাবেই তাদের অনির্বাণ ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম যে এ পদ্ধতিকে বাধা দিতেই হবে কিন্তু তাঁরা (ডিরেক্টররা) এ কাজ করতে ভয় পেয়েছেন। ফল দাঁড়িয়েছে যে আজ আমাদের নির্ভর-যোগ্য লগ্নীকৃত কোন রিজার্ভ ফাণ্ড (মজুত ভাণ্ডার) নেই। ডিরেক্টররা এইভাবে তাঁদের আত্মহননকারী নীতির মারফৎ আমাদের সর্বনাশের দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। এতদিনে কোটি টাকার ওপর রিজার্ভ ফাণ্ড গড়ে তোলা উচিত ছিল যার ফলে আমরা তিন চারটি ভিন্ন ভিন্ন বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে পারতাম, কিন্তু আমরা পারছি না। গত তিন চার বছর ধরেই কিছু অংশীদারের বোনাস চাওয়ার চিৎকারকে শান্ত করতে ডিরেক্টররা ব্যস্ত, তাদের বোঝাতে হচ্ছে যে বিভিন্ন ফাণ্ড, অগ্নিবীমা, ডিভিডেণ্ড সমীকরণ (equalizing) ফাণ্ড, সবই ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে আমরা শেষ করে ফেলেছি।

"গত আঠার দিন যাবৎ আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে শয্যাশায়ী। আমার ডাক্তারের কথা না মেনে আমি এই ছোট Note of Dissent লিখে পাঠালাম। এটা আমার Note of Warning'ও (সাবধান-বাণী) বটে। আমার নিজের মত বোঝাবার জন্যে বৃহৎ ইউরোপীয় ও মান্য-গণ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের পরিচালনায় বৃহৎ শিল্পের একটি তালিকা পাঠালাম—

(১) Anglo India Jute Mills Ltd.

ম্যানেজিং এজেন্ট—Duncan Brothers

মূলধন	রিজার্ভ ফাণ্ড	১৯৩৮ সালে দেওয়া ডিভিডেণ্ড
৪৯,২৬,৭০০ অর্ডিনারি শেয়ার	১১৮,০০,০০০	শূন্য
২৭,৬২,২০০ প্রেফারেন্স শেয়ার		

(২) Central India Weaving Cotton Mills Ltd.
ম্যানেজিং এজেন্ট—Tata & Sons

৪৬,৮৭,৫০০	১,৬৪,৪৮,২২৪	১১%

(৩) Delhi Cotton Mills

৩১,২৯,৭৯৭	১,০২,৬৪,৮৬০	৫%

আরও বলতে পারি, Britannia Biscuit Co., ইউরোপীয় পরিচালনার একটি সফল প্রতিষ্ঠান; তাদের অর্ধবাৎসরিক রিপোর্ট সদ্য বার করেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে মোট লাভের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার বেশি,—যে ভাবে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা হল—

প্রেফারেন্স শেয়ারে ৪%,সাধারণ শেয়ারে ২½%, ৩০,০০০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। বোঝা যাবে যে রিজার্ভ ফাণ্ড তৈরি একান্ত দরকারি কাজ—কিংবদন্তীর সেই পিঁপড়ের মত, যারা সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশ শীতকাল বা বিপদের দিনের জন্যে সরিয়ে রাখে।

কলিকাতা-১১ই জুলাই, ১৯৩৯ পি. সি. রায়"

বেঙ্গল কেমিক্যালের কেউ তাঁর সাবধান বাণীতে সেদিন কর্ণপাত করেনি। এই প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালী তথা ভারতীয়ের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে গড়ে তোলা গর্বের প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী-কালের অনিবার্য সংকটের কথা আজ সকলেই জানে।

অতি দুঃখের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দেন ঐ বছরেই।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ড অবশ্য একটা লোক দেখান প্রচেষ্টা করেছিলেন যাতে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। প্রফুল্লচন্দ্র করেন নি তা', বরং তিনি লিখলেন, কিভাবে তাঁর প্রস্তাবিত জিঙ্ক্-ক্লোরাইড তৈরির প্ল্যাণ্ট বসানর প্রচেষ্টা বানচাল করা হয়েছে তার বিবরণ। তিনি জানালেন, এই সংকটের সময়ে তাঁর সমস্ত রকম সাবধান বাণীতে যখন কান দেওয়া হয়নি, তখন তিনি কোম্পানীর কোনরকম দায়িত্ব আর স্বীকার করবেন না,—বিশেষতঃ

যখন নতুন গবেষণার দিকে কোম্পানীর কোন আগ্রহ নেই। "My joining the Board is out of question, specially in view of their attitude towards the research work as evidenced by their letter to Dr. M. N. Saha who sometime ago forwarded it to me...I am glad I can wash my hands clean of all responsibility in the matter of failure of the Bengal Chemical in the research line at this psychological moment.

"The fixed running idea of yours and the Directors had always been to squeeze out everything (like sugarcane) as long as they could offer large dividends.

Sd/- P. C. Ray

An evicted and a homeless stranger in the land (i.e. B. C. P. W.) he once called his own."

চিঠিটি তদানীন্তন ম্যানেজারকে লেখা। ১৯৪০-এর ৮ই জুন পরিচালক সমিতি এক কথায় প্রফুল্লচন্দ্রের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। কি পরম অভিমানভরে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন—evicted and homeless stranger in the land he once called his own (যে ভূমিকে একদা নিজের বলে জানতাম, সেখান থেকে বিতাড়িত, বাস্তুচ্যুত, বিদেশী) তা আমরা বুঝতে পারি।

১৯৪০ সালে তাঁর এক সহকর্মীর কাছে প্রফুল্লচন্দ্র যা লিখছেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায়—

"যখন আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল শুরু করি তখন কেবল যে বাঙ্গালীরা ব্যবসা করতে পারে না এই ধারণা মুছে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, বরং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়বারও ইচ্ছে ছিল। আমার কাছে বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধুমাত্র ডিভিডেণ্ড উপার্জনের

যন্ত্র মাত্র নয়—যদিও তারও নিশ্চয় প্রয়োজন আছে—তবুও শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক কত মধুর হতে পারে তা দেখানও উদ্দেশ্য ছিল। আমি আবার বলছি, আমাদের কর্মীরা, সামান্য মাইনের অফিসার থেকে শ্রমজীবী পর্যন্ত কেউ ঈর্ষাজনক অবস্থায় নেই। দশ বছর চাকরি করবার পর আমরা তাকে এক মাসের মাইনে (বোনাস?) দিচ্ছি আর পাঁচ বছর যে কাজ করছে তাকে দিচ্ছি আধ মাসের মাইনে। কিন্তু এই সেদিন বেঙ্গল পটারিজের মিঃ ভগত বললেন, যে পাঁচ বছর কাজ করছে তাকে এক মাসের, তিনবছর যে কাজ করছে তাকে আধ মাসের এ রকম ভাবেই বোনাস দেওয়া উচিত এবং শুধু অফিসার নয়, কুলি পর্যন্ত সকল শ্রেণীর কর্মীকেই বোনাস দেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে নতুন মালিকানায় পটারিজের কেটেছে মাত্র তিন বছর। এরা এখনও কোন ডিভিডেণ্ড দেয় নি।

"গত সপ্তাহে বাটা কোম্পানী আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সর্বত্র যে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা রয়েছে তা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। প্রত্যেকটি কর্মী খুশি ও হাসিমুখ……শ্রমিকদের কোয়ার্টার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।……আমাদের ডিরেক্টরদের ডিভিডেণ্ড-পাগলামী আর নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা আমার জীবনের স্বপ্নকে মিথ্যে করে দিয়েছে।"

প্রফুল্লচন্দ্র পরম দুঃখে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে তাঁর ৫০ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজার পেয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও কিছুকাল শ্রী বজায় রাখল। কিন্তু অদূরদর্শী পরিচালনা নতুন নতুন দিকে কোম্পানীকে বাড়তে দিল না। অ্যান্টি-বায়োটিক, অ্যালকালি, কোন নতুন উদ্যম নেওয়া গেল না। প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশঃই B. C. P. W. হঠে যেতে লাগল। লাভ দূরের কথা, ক্রমশঃ কোম্পানী দেনায় ডুবে গেল। অবশেষে রুগ্ন শিল্প হিসেবে সরকারী অধিগ্রহণে চলে গেল।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাবধান বাণী উপেক্ষা করবার ফল এভাবেই এই একদা পথিকৃৎ, বাঙ্গালীর গর্বের প্রতিষ্ঠানকে ভোগ করতে হল।

॥ অন্য কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রফুল্লচন্দ্র ॥

বেঙ্গল পটারিজ

প্রফুল্লচন্দ্র শুধুমাত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল নয়, বস্তুতঃ অনেকগুলি দেশী ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, যেগুলি মূলতঃ তাঁরই উৎসাহ ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল অথবা শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল নিজেদের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্, বেঙ্গল এনামেল, মার্কেন্টাইল মেরিন, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ভারতী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস্ ইত্যাদি। এদের সম্বন্ধে আর একটু বেশি কথা বলা দরকার।

১৯০১ সালে সাঁওতাল পরগণার রাজমহলের কাছে একটি জায়গায় এক ভদ্রলোক চিনেমাটির সন্ধান পান। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বহরমপুরের হেমেন্দ্রনাথ সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন একটি কোম্পানী গড়ে ঐ চিনেমাটি কাজে লাগিয়ে একটি পটারি বা চিনেমাটির বাসনের কারখানা শুরু করেন। প্রথমে কারখানার কাজকর্ম একেবারেই ভাল চলেনি। ১৯০৬ সালে জাপান থেকে চিনেমাটির কাজ শিখে আসা সত্যসুন্দর দেব কোম্পানীর ভার নিলেন। বেলেঘাটার ট্যাংরাতে ছোট কারখানা গড়ে উঠল। প্রথম প্রথম ব্যবসা ভাল চলতে আরম্ভ করল কিন্তু ক্রমশই জাপানী ও জার্মান সস্তা মালে বাজার ছেয়ে গেল। সত্যসুন্দরকে জার্মানী ও ইংলণ্ডে পাঠান হল সস্তায় মাল তৈরি করবার পদ্ধতি শিখে আসবার জন্যে। কিন্তু তবুও কোম্পানী লাভজনক হয়ে উঠল না। ১৯১৯ সালে কোম্পানীকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী করে দেওয়া হল। নাম হল বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড। মূলধন দাঁড়াল ১০ লক্ষ টাকা। প্রফুল্লচন্দ্র একজন ডিরেক্টর হলেন। তিনি নিজে জামিনদার হয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বার করে আনলেন। সত্যসুন্দর দেব তৈরি মাল সস্তা করবার জন্যে প্রাণপণে খাটতে লাগলেন। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের ৮০,০০০ টাকার শেয়ার ছিল। তিনি নিজে বিনা

পয়সায় কোম্পানীর জন্যে দিনে আট-দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানীকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে যথেষ্ট কাজ করতেন। অবশেষে কোম্পানী লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই তবে বর্তমানে এটিও রুগ্ন শিল্প আখ্যা পেয়েছে। সত্যসুন্দর দেব লিখছেন,—মাত্র ২০০০ টাকা মূলধন সম্বল করে তিনি মাণিকতলার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন লেনে ছোট্ট শেডে যে 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্' শুরু করেছিলেন তার প্রায় সামনের রাস্তা দিয়ে থার্ড ক্লাশ ছ্যাকড়া গাড়ি চড়ে আচার্য রায় চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রমুখদের নিয়ে বাগমারী খালের ধারে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় মিটিং ইত্যাদি করতে যেতেন। পথে নেমে পটারি ওয়ার্কস্ দেখে যেতে কখনও ভুলতেন না। ৪৫ নং ট্যাংরা রোডে বড় জায়গায় যখন ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্ চলে এল, জার্মানী থেকে আধুনিক পটারির উপযুক্ত মেশিন ইত্যাদি এসে পৌঁছল, তখনই আচার্য রায় রাজশেখর বসুকে সঙ্গে করে দেখতে এলেন। "১৯১৯ সালে 'বেঙ্গল পটারিজ' লিমিটেড কোম্পানী হয়ে 'ক্যালকাটা পটারিজের' দায়দায়িত্ব যখন নিয়ে নিল তখন আমার অনুরোধে আচার্য রায় একজন ডিরেক্টর হলেন। আমি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর থেকে কাজ ছেড়ে দিই কিন্তু আচার্য রায় আরও বহুদিন ডিরেক্টর ছিলেন।...Practically speaking, Acharya Roy was the central moving force and source of inspiration in both these national enterprises." (সত্যিকথা বলতে কি আচার্য রায় এই দুই জাতীয় উদ্যোগেরই মূল চালিকা শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস ছিলেন)।

সত্যসুন্দর দেব আরও লিখেছেন, কিভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল পটারিজের আর্থিক দুঃসময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার বন্দোবস্ত হল। আচার্য রায় সত্যসুন্দরকে নিয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের গভর্ণরস্-বোর্ডের একজন ভারতীয় সদস্য রাজা হৃষিকেশ লাহার কাছে গিয়ে তাঁকে রাজি করালেন। কিন্তু দুজন জামিনদার চাই। ঋণের পরিমাণ ২½ লক্ষ

টাকা! মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী একজন 'গ্যারান্টর' বা জামিনদার হতে রাজি হলেন। কিন্তু আর একজনকে জোগাড় করা মুশকিল হল। সত্যসুন্দর লিখছেন: (অনুবাদ) "আচার্য রায়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খোলাখুলি বলা ছাড়া উপায় রইল না। ব্যাঙ্কাররা ইতিমধ্যে লেনদেনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। সব শোনবার পর আচার্য বললেন, কিন্তু তিনি তো টাকাওয়ালা মানুষ নন, গরীব মাষ্টার মাত্র। ব্যাঙ্ক তাঁকে জামিনদার হিসেবে মেনে নিতে রাজি হবে না। আমার মনে পড়ছে, আমি তাঁকে বলেছিলাম,—আপনি বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়িতে বাস করেন (বিজ্ঞান কলেজের বাড়িতে), নামের পাশে একগাদা ডিগ্রি আছে, আপনি যদি রাজি থাকেন তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমি মজা করে বললাম, যদি ব্যাঙ্কের লোক খোঁজ খবর করতে আসে তাহলে যে চারপায়াটিতে তিনি শো'ন সেটি যেন কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়। তিনি হো হো করে হেসে সই করে দিলেন।

আমি সোজা ব্যাঙ্কে চলে গেলাম। একটা চিরকুটে তাঁর নামের সঙ্গে সরকারী যত খেতাব তিনি পেয়েছিলেন, মায় তাঁর 'স্যার' উপাধিটুকুও, লিখে সঙ্গে নিলাম। ব্যাঙ্কের 'ক্যাশ ক্রেডিট' (ঋণদান) বিভাগে যে সাহেবটি ছিলেন তিনি সদয়-হৃদয় বলে মনে হল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে জামিনদার দুজনের নাম লেখা কাগজটি দিলাম। তিনি মহারাজার নামটি পড়ে অপর মানুষটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি চিরকুটটি হাতে ধরিয়ে দিলাম। তিনি সেটি গভীর মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলেন তারপর সটান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে আসছি, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

ব্যাঙ্ক থেকে সোজা সায়েন্স কলেজে তাঁর কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠলাম—কে বলে আপনি গরীব মাষ্টার? আপনার দাম এখন আড়াই লক্ষ টাকা। তিনি হেসে দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে আদর

করে চড় ঘুসি মারতে লাগলেন। রাজশেখরবাবু এলে তাঁকে বললেন—"দেখ দেখ দেব আমায় কি করেছে। আমার দাম নাকি এখন আড়াই লাখ টাকা!"

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্

এটি ১৯২১ সালে শুরু হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কোম্পানী ১৯২১ সাল থেকেই পণ্য বাজারে ছাড়তে থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তাঁর ভাই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। তিনি জাপানে গিয়ে সেখানকার এনামেল কারখানার কাজকর্ম দেখে ও শিখে এলেন। ব্যারাকপুরের কাছে পলতায় আধুনিক কারখানা তৈরি হল। কোম্পানী মোটামুটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল। প্রফুল্লচন্দ্র এই শিল্প প্রচেষ্টার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময়ে কোম্পানী যথেষ্ট বেড়ে উঠেছিল কিন্তু বাঙ্গালীর ব্যবসা পরিচালনার অদূরদর্শিতা ও অক্ষমতার যে অনুযোগ প্রফুল্ল-চন্দ্রের মনে ছিল যেন তারই সপক্ষের প্রমাণ হিসেবে এই ব্যবসাটিও আধুনিক ম্যানেজমেন্টের অভাবে অধুনা রুগ্ন শিল্প হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্টেনলেস স্টিলের বাসন সহজলভ্য হওয়াও এনামেলের কারখানার সাবেকী বাজার ছোট হয়ে যাওয়ার একটি কারণ।

পণ্যবাহী জাহাজের ব্যবসা (মার্কেণ্টাইল মেরিন)

সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আনা নেওয়ার ভাড়া ও আভ্যন্তরীণ জলপথের শুল্ক হিসেবে বহু অর্থ দেশ থেকে চলে যেত বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর থলিতে। অতীতে ভারতবর্ষ অবশ্য নৌবাণিজ্যে স্বনির্ভর ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা প্রখর হয়ে উঠল। (ঊনবিংশ শতাব্দীর কার ঠাকুর কোম্পানীর জাহাজী কারবারের ইতিহাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী স্টীমার চালাবার চেষ্টার ঘটনা আরও কিছু পুরনো)।

ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে 'সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন' স্থাপিত হয়ে উপকূল বাণিজ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাল কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি অসম ও অন্যায্য প্রতিযোগিতায়—মূলতঃ মাল বহনের ভাড়া অন্যায়ভাবে কমিয়ে দিয়ে—ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীটিকে হটিয়ে দেবার কাজে কম চেষ্টা করে নি। আভ্যন্তরীণ জলপথে স্টীমার চালানতে এগিয়ে এসেছিল বাঙ্গালী কোম্পানীও। ভাগ্যকুলের যোগেন্দ্রনাধ রায় অসম প্রতিযোগিতায় জাহাজী ব্যবসা থেকে হঠে গেলেন, তাঁর ইষ্ট বেঙ্গল রিভার স্টীমার সার্ভিস কোম্পানীর তরফ থেকে সরকারী মার্কেন্টাইল মেরিন কমিটির কাছে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন পূর্ব ভারতের সমস্ত চটকল প্রথমতঃ দেশীয় স্টীমার কোম্পানীর জাহাজে মাল চলাচলের সুবিধে নিলেও, আর তার ফলে দেশী কোম্পানীর লাভ হতে থাকলেও শীঘ্রই ইউরোপীয় স্বার্থে বড় জাহাজ কোম্পানীগুলি এই ব্যবসায়ে নেমে পড়ে অন্তর্দেশীয় জলপথের বাণিজ্য থেকে অসাধু উপায়ে দেশী কোম্পানীকে হঠিয়ে দিতে পারল। মালের ভাড়া অন্যায়ভাবে তারা কমিয়ে দিল।

বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী উঠে গেল, বন্ধ হয়ে গেল বেঙ্গল-বার্মা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী। প্রফুল্লচন্দ্র একটি দেশী স্টীমার কোম্পানীর পরিচালক সমিতিতে ছিলেন। একটিমাত্র উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কি পরিমাণ অন্যায় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল। যে দূরত্বের স্টীমার ভাড়া ছিল ১ টাকা সেই ভাড়া সাহেব কোম্পানী রাতারাতি এক আনায় ($\frac{১}{১৬}$ ভাগ) নামিয়ে দিল। প্রফুল্লচন্দ্র যে স্টীমার কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারা কপোতাক্ষ নদের বুকে ঝিকরগাছা থেকে যাত্রী নিয়ে চলাচল করত,—তাদের মাত্র একটি স্টীমার ছিল। প্রফুল্ল-চন্দ্রের কোম্পানী এই অসম প্রতিযোগিতায় প্রায় ২ লক্ষ টাকা লোকসান দিল। ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ২০টি দেশী জাহাজী প্রতিষ্ঠান, যার মূলধন প্রায় ১০ কোটি টাকা,

বিদেশী বড় জাহাজী প্রতিষ্ঠানের অন্যায়ভাবে ভাড়া কমিয়ে দেবার প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ভি. জে. প্যাটেল প্রমুখ স্বদেশী সমর্থকরা সব সময়েই দেশী জাহাজী ব্যবসার পক্ষে প্রাণপণ সমর্থন দিয়েছেন। এই বিষয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহা একটি খুব মজার ঘটনার কথা লিখেছেন[১]—(অনুবাদ) "প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এদেশ থেকে অনেক লোক বিলেতে যেতে শুরু করলেন। ভারতবর্ষের প্রথম দেশী জাহাজ কোম্পানীগুলির অন্যতম, সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, ইউরোপ যাত্রীদের জন্যে Loyalty নামের একটি জাহাজ চালাতেন। স্যার পি. সি. রায় সম্ভবতঃ তাঁর সপ্তম বারের বিলেত যাত্রার সময়ে এই জাহাজের যাত্রী হয়েছিলেন। জাহাজে প্রধানতঃ ভারতীয়রাই যাত্রী ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন, যেমন বোম্বাই-এর ডঃ জীবরাজ মেহতা, লক্ষ্ণৌ-এর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, নৃতত্ত্ববিদ্ বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ। আমিও ঐ জাহাজেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু বেশীর ভাগ যাত্রীই সেবারে ছিল বাংলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা তরুণ ছাত্ররা যারা প্রথমবার বিলেতে পড়া-শোনা করতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু আই. সি. এস. অফিসারও ঐ জাহাজে চড়তে বাধ্য হয়েছিল যারা অন্য বড় বিদেশী জাহাজে জায়গা পায় নি। এডেনে পৌঁছবার মুখেই কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল যে স্বদেশী জাহাজী ব্যবসা সফল হতে পারে নি—খাবার-দাবার খারাপ, কেবিনগুলি অপরিষ্কার, যাত্রীদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। প্রায় প্রকাশ্যেই এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একদিন যখন স্যার পি. সি. রায় ডেকের ওপরে কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তাঁর হাতে একজন একটি দরখাস্ত দিল,—যাত্রীদের তরফ থেকে কয়েকজন সেই দরখাস্ত করেছেন নালিশ জানিয়ে, যা কোন এক জাহাজী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক বড় কর্তার কাছে যাবে। দরখাস্তে ছিল,

---

১। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের The Calcutta Municipal Gazette পত্রিকায়।

সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীকে আর এই জাহাজ চালাতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তারা যাত্রীদের ঠিকমত দেখাশোনা করে না। যারা তাঁর কাছে দরখাস্তটা নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল পাঞ্জাব থেকে আসা অল্পবয়সী ছেলে, কিছু বাঙ্গালী ছেলেও সেই দলে ছিল। তারা স্যার পি. সি. রায়কে ঐ দরখাস্তে সই করে দিতে বলল। তিনি দরখাস্তটা একবার, দুবার, তিনবার পড়লেন তারপর ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কেউ এর আগে ইউরোপে গেছে কি না। তারা বলল,—"না"। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তারা কি করে জানল যে এই জাহাজের বন্দোবস্ত ইত্যাদি অন্য ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় জাহাজের তুলনায় নিকৃষ্ট? তারা বলল, ইংরেজ সহযাত্রীদের কাছ থেকে তারা এটা শুনেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ একজন ইংরেজ আই. সি. এস. অফিসারের নাম করল তারা। স্যার পি. সি. রায় বললেন,—"বাছারা, আমি এবার নিয়ে সাতবার বিলেতে যাচ্ছি। আমি আগে **P. & O.** আর অন্য ইউরোপীয় জাহাজেও গিয়েছি। আমি জোর করে বলতে পারি, খাবার-দাবার আর অন্যান্য বন্দোবস্তেও এ জাহাজ যে কোনও ব্রিটিশ বা বিদেশী জাহাজের সমকক্ষ।" ছেলেরা অনেক তর্ক-বিতর্ক করল, কিন্তু অবশেষে স্বীকার করল, এই দরখাস্ত দেবার ব্যাপারটি একজন ইউরোপীয় যাত্রীই তাদের মাথায় ঢুকিয়েছে। স্যার পি. সি. রায় তখন বললেন,—"এই দরখাস্তটা নিয়ে এখন কি করব? সমুদ্রে ফেলে দেব?" তারা সবাই স্বীকার করল। দরখাস্তটা ছিঁড়ে তিনি জলে ফেলে দিলেন।"

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি কোম্পানী

প্রকাশনার ব্যবসাতে প্রফুল্লচন্দ্রের উৎসাহ ছিল। ১৯১০ সালে, যে বছরে হেমেন্দ্র সেন, বিমানবিহারী দে, প্রিয়দা রায় প্রমুখেরা এম. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করলেন সেই একই বছরে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুন্দলাল চক্রবর্তী ও

অহীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। প্রফুল্লচন্দ্র এঁদের তিনজনকে প্রকাশনার ব্যবসায় নামতে উপদেশ দিলেন। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বিখ্যাত "চ—চ্যা"—চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং। প্রকাশনা জগতে এঁরা আজও শ্রদ্ধেয় নাম। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের যাবতীয় পত্রপত্রিকা বা বই ছাপাবার দায়িত্ব এঁদের দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বই, যা আত্মজীবনী, Life and Experiences of a Bengali Chemist এঁরাই প্রকাশ করেন। 'দেশী রং', 'জাতি গঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে', 'Makers of Modern Chemistry', 'মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়', 'অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার', 'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়', 'খাদ্য বিজ্ঞান'—আত্মচরিত ছাড়া এগুলিরও প্রকাশক চক্রবর্তী চ্যাটার্জি। তাঁর শেষ প্রকাশনা, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি প্রকাশ করেন ১৯৪১ সালে।

স্বদেশী ইনসিওরেন্স ব্যবসা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এদেশ থেকে জীবন-বীমার প্রিমিয়াম হিসেবে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির ঘরে চলে গেছে প্রায় ৫ কোটি টাকা। অবশ্য সে সময়ে অনেকগুলি, বস্তুত ২১টি ভারতীয় বীমা কোম্পানী ছিল,—মাত্র তিনটি বাঙ্গালীর। ঐ পাঁচ কোটির মধ্যে বেশি টাকাটাই উঠত বাঙ্গলা থেকে। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে জোরদার করবার দিকে নজর দিলেন। বিপিন বিহারী চক্রবর্তী লিখছেন, —"তিনি দেখিয়াছিলেন সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তিরোধানে কত সংসার ভাঙ্গিয়া যায়, কত বিধবা ও অনাথ শিশু অসীম দুর্দশায় নিপতিত হয়। আর শুধু তাই বা কেন. দেশের বেশির ভাগই কর্ম জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে কিছুই নাই। অনশনের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অথচ এই দুর্দিনে সমস্যার সমাধান হইতে পারে জীবনবীমার

সাহায্যে। তাই তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে লইয়া আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী গঠন করেন।' আর্যস্থান ইনসিওরেন্সের শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে ব্যবসা বাড়াতে লাগলেন।

অন্যান্য ব্যবসায়ে প্রফুল্লচন্দ্র

কর্মবীর আলামোহন দাসকে প্রফুল্লচন্দ্র খুবই প্রশংসা করতেন। তাঁর কারখানার শ্রীবৃদ্ধির মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্রশংস প্রচার খুবই সাহায্য করেছিল।

তাঁর অন্যতম বন্ধু স্যার নীলরতন সরকারের ন্যাশানাল ট্যানারি ওয়ার্কস্-এর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশী সাবান তৈরিতে প্রফুল্লচন্দ্রের উৎসাহ অবশেষে বেঙ্গল কেমিক্যালে সাবান তৈরির বিরাট পরিকল্পনাকে সফল করেছিল। তাঁর ছাত্র বীরেন মৈত্র ক্যালকাটা কেমিক্যাল স্থাপন করেছিলেন,—এতেও প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্বাদের অভাব হয় নি।

॥ বন্যা, তুর্ভিক্ষ এবং প্রফুল্লচন্দ্র ॥

প্রফুল্লচন্দ্রের নাম যে এক সময়ে বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা হত সে কেবলমাত্র তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও শিক্ষা জগতে তাঁর অবদানের জন্যে, তা নয়। প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজ সচেতনতা ও সমাজ সেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রায় তুর্দমনীয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরের প্রবল বন্যায় বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল ভেসে যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রাণের কাজে। বিদেশী সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি বন্যাত্রাণ আর তারপরের অপরিহার্য পুনর্বাসনের। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রবাহিনী নিয়ে একাজে নেমেছিলেন।

১৯২১ সালে প্রতি বছরের মতই তিনি গরমের ছুটি কাটাতে নিজের দেশের বাড়িতে, খুলনায় যাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন খুলনা অঞ্চলে ফসল হয়নি। কিন্তু এখন তাঁর চোখে পড়তে লাগল তুর্ভিক্ষের কি ভয়াবহ চেহারা হয়েছে খুলনার গ্রামে-গঞ্জে। কোথাও চাল পাওয়া যায় না। ক্ষুধার বীভৎস রূপ দিকে দিকে নগ্ন চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যথারীতি সরকার থেকে ত্রাণের কোন চেষ্টা নেই। প্রফুল্লচন্দ্র দেখলেন, সরকারের ওপরে নির্ভর না করে দেশের লোকেরা একটি তুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি গড়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের হয়ে কাজে লেগে গেলেন। প্রধানতঃ বরিশাল ও ফরিদপুর থেকে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক এসে যোগ দিল। খুলনার নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং কুঞ্জলাল ঘোষ ডাঃ রায়ের সঙ্গে তুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজের দায়িত্বভার নিলেন।

১৯২২-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে গেল। উত্তরবঙ্গ দেশের অন্য অংশ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ বন্যার ভয়াবহতা বর্ণনার অতীত। এই অভূতপূর্ব বন্যায় ত্রাণের কাজে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সেবাব্রতী ছাত্রদের নিয়ে নামলেন। বন্যাত্রাণ সমিতির মূলকেন্দ্র হল বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ। এই সমিতিতে কাজ করতে এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্মীরা। সমিতির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র নিজে জলমগ্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার দুর্দশা নিজের চোখে দেখে বাংলা কংগ্রেস ও বঙ্গীয় যুব সংঘকে অনুরোধ করলেন বন্যাত্রাণে এগিয়ে আসবার জন্যে। বিজ্ঞান কলেজে পড়াশোনা, গবেষণা সবই প্রায় মুলতুবী! প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকে প্রত্যহ অজস্র মানুষ বিজ্ঞান কলেজে এসে তাঁর কাছে তাদের দান পৌঁছে দিতে লাগল। প্রায় সত্তরজন স্বেচ্ছাসেবক সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে থেকে সেই অজস্র দান সংগ্রহ করতে লাগল।

যথারীতি সরকারী সাহায্যের কোন চিহ্ন নেই। প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনীতে ‘ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় এ বিষয়ে কি লেখা হয়েছিল তার উদ্ধৃতি রয়েছে—(অনুবাদ) “যখন বিপদ এসেছিল তখন গভর্নমেণ্ট বন্যার জলের “লেভেলের” অনেক ওপরে, দার্জিলিং-এ রয়েছেন (অবশ্য এখনও তাঁরা সেখানেই আছেন)। প্রাথমিক রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁদের কোনরকম ধারণাই হয়নি। তাঁদের নড়তে চড়তে অনেক সময় গেল। যখন তাঁরা নড়লেন, উদ্যোগ অতিশয় ক্ষীণ,—তাঁদের দান স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যেটুকু তাঁরা করেছেন তা কেবল বিরূপ জনমতে তাড়িত হয়ে, বাধ্য হয়ে। বাঙ্গলার জনসাধারণের মনে অবশ্যম্ভাবী এই ধারণাই হয়েছিল।

“এই অবস্থায় এক রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, স্যার পি. সি. রায় এগিয়ে এলেন ; গভর্নমেণ্ট যা করল না, তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে সেই দায়িত্ব তুলে নিতে ডাক দিলেন। তাঁর ডাকে দেশবাসী সোৎসাহে সাড়া দিল। একমাসের মধ্যে বাঙ্গলার জনসাধারণ

তিন লক্ষ টাকা দান করল। ধনীর গৃহিণী তাঁর দামী সিল্কের শাড়িও দান করলেন, নিম্নবিত্তেরা তাঁদের পরিমিত পরিধেয় থেকেও বস্ত্র দান করলেন। শত শত স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এল, ত্রাণের জিনিসপত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিলি করবার কাজে যোগ দেবার জন্যে। এ কাজে ম্যালেরিয়া অধ্যুসিত গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হত তাদের।

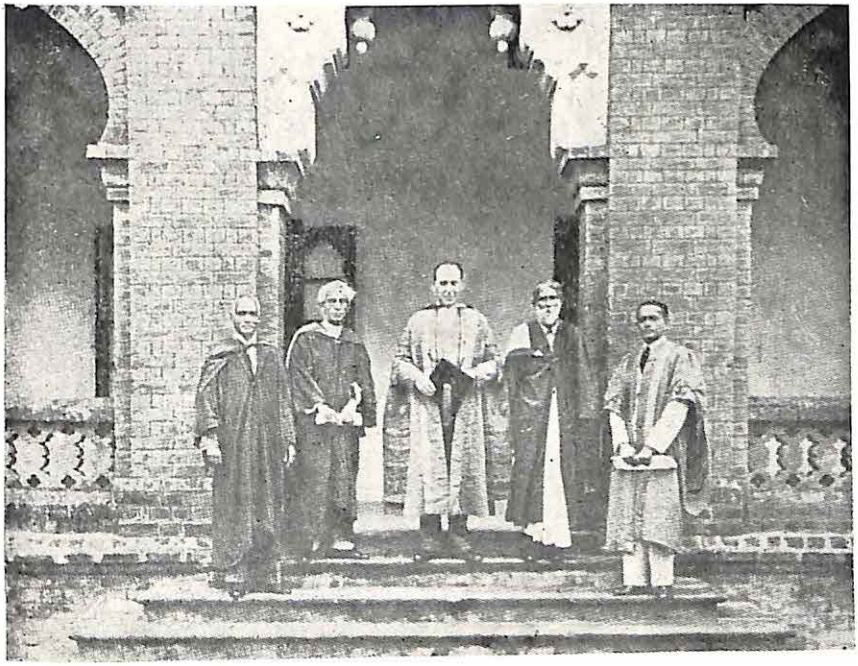
"গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল যে রেলওয়ের পত্তনের ডিজাইনের ভুলের দরুন জল-নিকাশি ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। এর যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে আরও দেড়মাস সময় গেল এ বিষয়ে অনুসন্ধানের একটা প্রতিশ্রুতি দিতে।

"স্যার পি. সি. রায়ের আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ার আংশিক কারণ হচ্ছে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে 'একহাত নেওয়া'র বাঙ্গালী-সুলভ প্রবণতা, কিছুটা দুর্গতদের জন্যে সত্যিকারের সহানুভূতি। বেশিটাই অবশ্য স্যার পি.সি. রায়ের লক্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ। স্যার পি. সি. রায় পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞানী। আমি বলছি না তিনি অকৃত্রিম 'অসহযোগী' (Non-Co-operator) কিন্তু তিনি তীব্র জাতীয়তাবাদী এবং সরকারের কড়া সমালোচক। সেইসঙ্গে তিনি সত্যিকারের সংগঠক আর সত্যিকারের শিক্ষক। আমি একজন ইউরোপীয়কে বলতে শুনেছি, 'যদি মিঃ গান্ধী আরও দুটি পি. সি. রায় পেতেন তবে তিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আদায় করে নিতে পারতেন। এক বাঙ্গালী ছাত্র আমাকে বলেছিল,—'যদি কোন গভর্নমেণ্ট অফিসার বা কোনও তথাকথিত 'অসহযোগী' রাজনৈতিক নেতা চাঁদা চাইতেন সাধারণ মানুষ একটা পয়সাও দিত না। কিন্তু যখন পি. সি. রায় সাহায্য ভিক্ষা করেন তখন মানুষ জানে যে টাকা ঠিকমতই খরচা হবে, নষ্ট হবে না।' আমার কলকাতায় তাঁর আস্তানা সায়েন্স কলেজে স্যার পি. সি. রায়কে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার বোধ হয় আমি বুঝতে পেরেছি কেন তাঁর ওপরে তাঁর দেশবাসীর এত বিশ্বাস। একদিন সমব্যথী

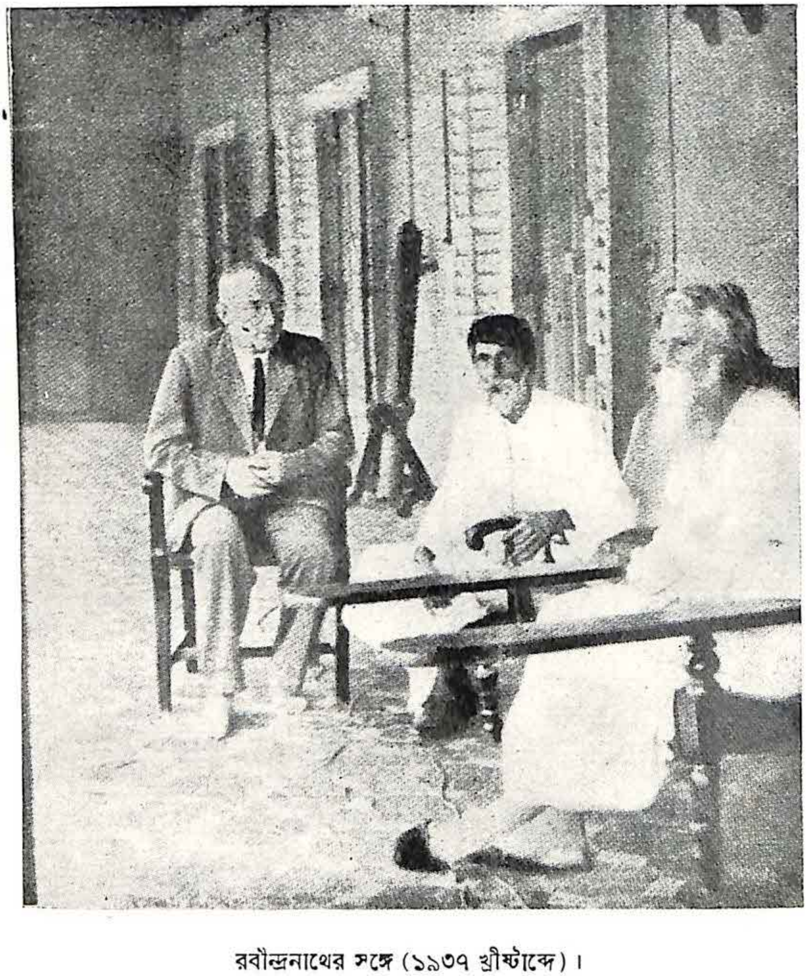
মানুষদের দেওয়া গাদা গাদা নতুন পুরনো জামা কাপড়ের স্তূপের দিকে তিনি সহর্ষে চেয়ে ছিলেন। তাঁর তদারকীতে ভলান্টিয়াররা এলোমেলো সেই পাঁজার মধ্যে থেকে বেছে একটা শৃংখলা আনবার চেষ্টা করছিল, কি করে সঠিক জায়গায় ত্রাণের জন্যে সেগুলিকে পাঠান যায়। পরের দিনই আমি দেখলাম তাঁর দুই ছাত্রকে রসায়নের একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে তিনি সাহায্য করছেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সত্যিকারের প্রীতির সম্বন্ধটি আমি বুঝতে পারলাম। যখন তিনি গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করেন তখন আমার মনে হয় সরকারের বদলে আমি তাঁর কর্মচারী হয়ে যাই। প্রভূত কর্মক্ষমতার সঙ্গে তাঁর রক্তের মধ্যে রয়েছে উষ্ণ অধীরতা আর তা তাঁকে "নিরপেক্ষ" সমালোচক করে তুলতে অবশ্যই পারে না। কিন্তু যদি কেউ তাঁর সমালোচনায় আহত হয় তবে তার এটুকু বুঝে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে অন্যান্য বহু সমালোচকের তিনি ব্যতিক্রম কারণ স্যার পি. সি. রায়কে যে কোনও কাজের সুযোগ দিলে তিনি নিজে হাতে সে কাজ সমাধা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং অন্য অনেকের মতনই বা তার চেয়ে ভালভাবে তা করতে পারবেন।

"আমি যখন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে গেলাম তখন বন্যার পরে দেড়মাস কেটে গেছে। জল নেমে গেছে কিন্তু ক্ষতি যে বিপুল তার চিহ্ন চতুর্দিকে। বিভিন্ন ত্রাণ-প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সবচেয়ে বৃহৎ এবং সবচেয়ে ব্যস্ত অবশ্য স্যার পি. সি. রায়ের 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি'। এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় কিন্তু এদের মধ্যে উত্তর ভারতীয় কর্মী এক জনকেও দেখলাম না যে Non-Cooperator (অসহযোগী) নয়।"

১৯৩১ সালে উত্তরবঙ্গে আর পূর্ববঙ্গে আবার প্রবল বন্যা হল। আবার আত্রাই ভাসল। সমস্ত ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা বন্যার জলে ডুবে গেল। একটি হিসেবে বলা হয়েছে এ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি (তখনকার টাকার হিসেবে) আট থেকে দশ কোটি টাকার মত।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানসূচক ডি.এস.সি. পাবার পর।
বাঁদিক থেকে : স্যার যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চ্যান্সেলর স্যার জন অ্যাণ্ডারসন,
আচার্য রায়, ভাইস-চ্যান্সেলর এ. এম. রহমান।



রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে)।

এটি খুব সাবধানীর হিসেবে, প্রকৃত ক্ষতি হয়ত আরও বেশি। প্রফুল্লচন্দ্র আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রাণের কাজে। এবারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সংকট ত্রাণ সমিতি'। আগের মতই বিজ্ঞান কলেজ হল ত্রাণ সমিতির মূল কেন্দ্র। কাঁথি, তমলুক অঞ্চল থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবক এল। যথারীতি গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেই! দেশের লোক একটা শিক্ষা পেল। দুর্দশা যখন দেশের ওপর ছায়া ফেলে, তার প্রতিকারের জন্যে দেশের জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হয়, 'একপ্রাণ একতার' উদাহরণ হয়ে।

নিজে সারাজীবনই সুস্বাস্থ্যের অভাব ভোগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ বা বন্যার মাঝখানে, সরেজমিনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বারবার। নিমাইদাস রায়চৌধুরী লিখছেন,—"১৯২০-২১ সালে খুলনা জেলা ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়, ফলে দারুন দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। আচার্যদেব নিজে পদব্রজে রোজ ১০-১২ মাইল গ্রামের দুর্গম পথ অতিক্রম করে সাঁইহাটি, রাড়ুলি, কাটপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করেছিলেন। উল্লেখ করা উচিত যে সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গ্রামে তাঁর চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত নেতা ডাঃ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রথম বাঙ্গালী মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন,—"বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে উত্তরবঙ্গের প্রচণ্ড বন্যায় পীড়িত নরনারীর কাতর আর্তি আজীবন লোকহিতব্রতী এই মানুষটিকে কতদূর ব্যথিত করেছিল এবং তাঁর আহ্বানে দেশে আর্তত্রাণে কি অদ্ভুত সাড়া জেগেছিল তা স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর আহ্বানে তখনকার বাঙ্গলার যুবকের দলও সুভাষচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ রাষ্ট্রীক ও সামাজিক নেতৃবর্গের নেতৃত্বে এই সেবাকার্যে এগিয়ে এলেন। সেই সময়ে

আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি সেই সেবা প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক রূপে গৃহীত হই। প্রত্যহই টাকা পয়সা ও দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ, রক্ষা ও বিলি ব্যবস্থার জন্য আমাকে বিজ্ঞান কলেজে উপস্থিত থাকতে হত। আচার্যদেবের অনুপ্রেরণা এবং সুভাষ ও মেঘনাদ প্রমুখের আহ্বানে ক্রমশঃই মানুষের মনে দানের প্রেরণা বাড়তে লাগল আর প্রত্যহই আমাদের কার্যালয়ে দানসামগ্রীর স্তূপ জমে উঠতে লাগল। টাকাকড়ির হিসাব মেলাতে মেলাতে, প্রাপ্ত দ্রব্যসম্ভারের হিসাব নিকাশ ও বিলি ব্যবস্থা ঠিক করতে করতে আমাদের যখন ক্লান্তি আসত তখনও আচার্যদেব তাঁর নিজস্ব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর আপাত রুক্ষ চেহারার আড়ালে যে স্নেহের ফল্গুধারাটি প্রবহমান ছিল—এই সময়ে বার বার তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তিনি এই সময়ে বসে বসে আমাদের নানা-রকম রসমধুর গল্প শোনাতেন আর তাঁর সযত্নে রাখা ভাণ্ডারে সঞ্চিত মুড়ির মোয়া, পাটালিগুড় ইত্যাদি বের করে আমাদের খেতে দিতেন। তাঁর রান্নার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যও আহার্য তৈরি করিয়ে তিনি সামনে বসিয়ে আমাদের খাওয়াতেন।

"এই সেবাকার্য শেষ হয়ে যাবার পর দেখা গেল তিন লক্ষের কিছু বেশি টাকা তখনও হাতে রয়ে গেছে।...বন্যার প্রকোপ সাময়িকভাবে মোচন হয়ে যাবার পর এই অঞ্চলের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও স্থায়ী গঠনমূলক কাজের জন্য আচার্যদেব একটি ট্রাষ্টিবোর্ড গঠন করে এই উদ্বৃত্ত অর্থ তাদের হাতে অর্পণ করেন। তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মী নীরেন্দ্রনাথ দত্ত কেন্দ্র পরিচালক নির্বাচিত হয়ে সেখানে খদ্দর বয়ন, কৃষি ও পশুপালন প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবস্থাসহ চিকিৎসাকেন্দ্র ও পাঠাগার স্থাপনের বন্দোবস্ত করেন। সুখের বিষয় যে, এই কেন্দ্রটি স্বাবলম্বী হয়ে এখনও (১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে) নীরেনবাবুর পরিচালনায় বর্তমান আছে। এই ট্রাষ্টিবোর্ডে আচার্যদেব স্বয়ং, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, অধ্যাপক

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও আমি মেম্বর ছিলাম। নিয়মিতভাবে এই ট্রাষ্টি-বোর্ডের সভায় পরীক্ষিত হিসাব ও কার্যবিবরণী পেশ করা হত ; আমি সে বিষয়ে স্বয়ং সাক্ষী দিতে পারি। স্বর্গারোহণের সামান্য কিছুদিন পূর্বে বর্তমানে (১৯৬২) পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত শ্রীপুরে তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য অরবিন্দ সর্দারের বাড়িতে এই ট্রাষ্টিবোর্ডের যে সভা হয়, তাতেও আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন জানা গেল যে, সেবাকেন্দ্রটি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ট্রাষ্টিগণের উপর ন্যস্ত টাকাঃপ্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

"উত্তরবঙ্গ প্লাবনের পর কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় দুটি প্লাবনেও তাঁর সেবাহস্ত প্রসারিত হয়। দুবারই আমাকে সম্পাদক নিযুক্ত করে সরেজমিনে সেবাকার্য তদারক করবার জন্য তিনি যখন আমাকে পাঠান তখন কোনও সেবাকর্মী কোনও অপকার্য অথবা সাহায্য বিতরণে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করছেন কিনা, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই সেবাকার্যের শেষে স্থায়ী গঠনমূলক কর্মের জন্য তমলুকের কুলাপাড়া ও মেদিনীপুরের জুখিয়াতে খদ্দর তৈরির কেন্দ্র করে কুলাপাড়া কেন্দ্রের ভার ভীমাচরণ মহাপাত্র ও জীবেশ মিশ্রের উপর এবং জুখিয়া কেন্দ্রের ভার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে অর্পণ করি।..."

॥ **খাদি, চরখা ও প্রফুল্লচন্দ্র** ॥

ইং ১৯২৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে একটি চিঠি লিখছেন (ব্রজেন্দ্রনাথ তখন মহীশূরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য) যার সম্বোধনে তিনি বলছেন : "My dear Charakarshi*—"

*Double Entendre

Charka + Rishi, and Charkā + Rishi"

অর্থ হল—"চরকর্ষি" নামে তাঁকে সম্বোধন করা হল দ্বর্থে : "চরক + ঋষি" এবং "চরকা + ঋষি"।

গান্ধীজির প্রভাবে এসে প্রফুল্লচন্দ্র খাদি আন্দোলন ও চরখা নিয়ে মেতেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় স্বনির্ভরতার

কাজের কর্মসূচীতে চরখার ভূমিকায় তাঁর আস্থার অভাব ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ আরও একটি চিঠিতে (১০ই অক্টোবর, ১৯২৬) বিশদ-করে লিখছেন—"you are not only a Rishi of the test tube, and of Charkā ;—but like Charaka (চরক, প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ) himself you are also a man of letters."

১৯৩১ সালে পুণাতে Indian National Swadeshi Exhibition নামে স্বদেশী পণ্যের প্রদর্শনী হয়। মেলার উদ্বোধন করে প্রফুল্লচন্দ্র যা বলেছিলেন তার কিছুটার অনুবাদ: "এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এডিনবরায় গত শতাব্দীর আশির দশকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকে আমি পশ্চিমী বিজ্ঞানের ভক্ত ছাত্র। আজ এই সত্তর বছর বয়সেও আমার মূল্যবান সময়ের বেশিটাই কাটে সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু আমি আমার একান্ত ভালবাসার বিজ্ঞান চর্চাকে ব্যবহারিক কাজে লাগাবারই প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছি। বস্তুতঃ এখানেও আমি এসেছি আমাদের শিল্প সংস্থার তৈরি কিছু রাসায়নিক জিনিস প্রদর্শন করতে। যখন মহাত্মাজী ১৯২১ সালে প্রথমে তাঁর নতুন আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে চরখা আমদানী করলেন তখন যন্ত্র সভ্যতায় বিশ্বাসী আমি ঐ মধ্যযুগের স্মৃতিচিহ্নকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা দেখে প্রচুর হেসেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আক্রান্ত নিজের প্রদেশ বাঙ্গলার বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণের কাজে কর্তব্যতাড়িত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল আর তখনই মনে হল জমিতে যখন ফসল নেই তখন ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিকল্প কাজ দেওয়া দরকার।"

প্রফুল্লচন্দ্র এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন না যে ভারতে প্রত্যেকটি গ্রাম নিজস্ব অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ছোট ছোট টুকরো-স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবে। সুতরাং চরখা-নির্ভরতার যে ধরনের অপব্যাখ্যা 'অসহযোগী' 'স্বদেশীগণের' কিছু অংশ করতেন,—গান্ধী প্রবর্তিত অর্থ নৈতিক স্বনির্ভরতার সূচীর

সবটাই আধুনিক ভারতের উপযোগী—এ বিশ্বাস তিনি হাস্যকর মনে করতেন। তবুও ১৯২৩ সালে কোকনদে 'খাদি প্রদর্শনী'র দ্বারোদ্ঘাটন করে তিনি বক্তৃতায় বললেন,—যে তিনি অন্ততঃ আট বছর বিলেতে কাটিয়েছেন; পশ্চিমী সভ্যতার অবদান, শিল্প কারখানা, অন্ততঃ একটির তিনি পত্তন করেছেন। জার্মান রসায়নবিদ Liebig-এর মতে কোন্ জাতি কত সভ্য তার মাপকাঠি হচ্ছে সাবান কতটা তারা খরচ করে বা সালফিউরিক অ্যাসিড কতটা তারা তৈরি করে কাজে লাগায়, তার পরিমাণ। প্রফুল্লচন্দ্র অন্ততঃ দুটি যন্ত্রনির্ভর কারখানার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত যারা সাবান ও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। তবুও তিনি ডাক দিচ্ছেন চরখা ও খাদি প্রচলনের উদ্দেশ্যে। তিনি জানতেন, ভারতের মত বিরাট দেশে, যেখানে যে কোন সময়েই জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, সেখানে একমাত্র বৃহৎ শিল্পই অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না,—গ্রামীণ ভারতে কুটির শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন থাকবেই।

প্রফুল্লচন্দ্র জানতেন, গান্ধীজি চরখার প্রচলনের পক্ষে ডাক দেবার বহু আগে, অন্ততঃ ৭৫ বছর আগে H. T. Colebrooke এ দেশে চরখা প্রচলনের পক্ষে কথা বলেন। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে বুঝিয়েছিলেন যে এর ফলে ইংলণ্ডও লাভবান হবে। রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of India তে' ও একই গল্প রয়েছে। সুতরাং গান্ধীজি যখন বিদেশী কাপড় বর্জন ও চরখার প্রচলনের প্রস্তাব করলেন প্রফুল্লচন্দ্র তখন সর্বতোভাবে তা সমর্থন করেছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের হিসেবে, যদি গ্রামে গ্রামে সঠিকভাবে চরখার প্রচলন হয় তবে দেশের ৬০।৭০ কোটি টাকা বেঁচে যাবে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের স্বদেশী প্রদর্শনীতে Gospel of Swadeshi নামের বক্তৃতায় তিনি বললেন,—"সম্পদ বণ্টন সম্পদ সৃষ্টির সমস্যার চেয়ে কম জরুরী নয়। যদি আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অনশনে কাটায় আর কয়েকজন সৌভাগ্যবান মিল মালিক অন্যায় লাভের অঙ্কে মোটা হতে থাকে, তবে তাতে দেশের কি লাভ?

সম্পদের অসম সঞ্চয় ঘটবে। আমাদের সমাজে সমস্যার অন্ত নেই; সম্পদ অসমভাবে কুক্ষিগত হলে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও বেকারত্ব ভয়াবহ শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দেবে যার ফলে অধিকতর সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে। আমি বলছি না যে সমস্ত বৃহৎ শিল্প ভেঙ্গে দেওয়া হোক। এটা এত সহজ নয়, আমি চেষ্টা করলেও তা পারব না। কিন্তু (সংগ্রামের মত) ক্ষতিকর নয় এমন পদ্ধতিতে যদি সম্পদের সমবণ্টন হয় তবে সেটিই তো কাম্য। চরখার প্রচলন হলে এই সমবণ্টন আপনা হতেই সম্ভব হবে।··চরখা নতুন কোনও জিনিস নয়, ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই কৃষির পরেই চরখা ও বয়নশিল্প ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির অঙ্গ।”

১৯২৫ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সদ্যপ্রয়াত চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিসভায় একই মঞ্চে বসে গান্ধীজি ও প্রফুল্লচন্দ্র চরখায় সূতা কাটছেন, এ দৃশ্য এখনও অনেকের স্মরণে আছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম সুহৃৎ, জগদীশচন্দ্র কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে চরখা অপরিহার্য বলে মনে করতেন না। তিনি বলতেন— “পা দিয়ে যে কাজ করা যায় তা হাত দিয়ে করতে যাব কেন?” রবীন্দ্রনাথও চরখা প্রচলনে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র নিজে নিয়মিত চরখা কেটে এবং একটা খদ্দরের লুঙ্গি পরে আমরণ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বলতেন, “I am the disciple of the semi-naked Fakir.”

॥ স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রফুল্লচন্দ্র ॥

ইংরেজী ১৯০৫ সালের পরে বঙ্গ বিভাগকে উপলক্ষ করে ও সুরেন্দ্রনাথকে মুখ্য নেতা করে এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিল বিলাতী বর্জন। বাঙ্গলা দেশেই এই আন্দোলনের উত্তেজনা চরমে ওঠে। বিলাতী পোষাক পোড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দেশী বস্ত্রশিল্পের পত্তনে এ দেশের লোক এগিয়ে এল না। সে সুযোগ নিল বোম্বাই ও আমেদাবাদের

মিল মালিকরা। স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির পূর্ণ রূপ কি হবে সে চিন্তা নেতাদের মনে পরিষ্কার ছিল না। সে আন্দোলনে চরখা বা খাদির ভূমিকাকেও মুখ্য করে দেখা হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনকে স্বরাজ লাভের রাজনৈতিক আন্দোলন করেই তোলা হয়েছিল। ইংরেজের অবিচারের, বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য যে রসাতলে গিয়েছিল তার কিছুটা আলোচনা করেছি পঞ্চম পরিচ্ছেদে। প্রফুল্লচন্দ্র বুঝেছিলেন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে দেশী শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে তুলতে হবে,—তিনি নিজে এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন,—কিন্তু বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার চেষ্টা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়; বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়তে হবে, তিনি বারবার বলেছেন। কিন্তু গ্রাম বাংলার তথা গ্রাম প্রধান ভারতের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করতে চরখা বা খাদির প্রবর্তনের প্রস্তাব গান্ধীজি প্রবর্তিত পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ,—স্বদেশী আন্দোলনে তা মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। ফলে আমরা দেখি রাজনীতি ও সমাজ-সচেতন, জনদরদী প্রফুল্লচন্দ্র একাধারে বৃহৎ শিল্পসৃষ্টিতেও অগ্রণীর ভূমিকা নিচ্ছেন, আবার গান্ধীজির শিষ্য হিসেবে ঘরে ঘরে চরখা প্রবর্তনের কথাও বলছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন মুখ্যত 'বয়কট' বা বিদেশী জিনিস বর্জনের আন্দোলন ছিল। কিন্তু পরিপূরক স্বদেশী জিনিস সৃষ্টির আন্দোলন হয়ে ওঠেনি তা। প্রফুল্লচন্দ্রের চোখে এই ফাঁকি উজ্জ্বল হয়ে ধরা ছিল।

গান্ধী-আন্দোলনের মধ্যেও শুধু চরখা ও খাদি প্রচারের কর্মসূচী ছাড়া অসহযোগ অথবা অহিংস বিপ্লবে কোন সক্রিয় অংশ প্রফুল্লচন্দ্র নেন নি। তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন প্রায় কংগ্রেসের জন্মকাল থেকেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বের নায়কদের সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়। স্বাধীনতার যুদ্ধের সর্বস্তরে সৈনিকরা পেয়েছে তাঁর পরামর্শ আর আশীর্বাদ। কিন্তু তিনি নিজে

সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখছেন,—
"His concern for the economic uplift of the people made him a politician and a social and religious reformer. But he was for preserving the tree—not for cutting it down in the zeal for reform. It made him shun active and aggressive politics and aggressive social and religious reforms. The Indian National Congress being the one and only representative political organization of the people, he had sympathy for it. But he was fully aware of the fact that in India methods to attain independence had been as many as three—the constitutional agitation (with its protest, prayer and petition), the physical force movement (with its cult of the bomb and the revolver) and the non-violent non co-operation movement originated in Bengal to combat the oppression of the indigo planters and adopted by Mohandas Karamchand Gandhi for mass movement in politics (with *Satyagraha* as its weapon). Acharya Ray lent his support to all these methods and those who had the good fortune to know him intimately cannot but admit that the great scientist had great and unstinted appreciation of the bravery, the determination and the sacrifice of those who adopted the second method to achieve the end."

এর সারাংশ হচ্ছে,—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তাঁর কাম্য

হওয়ায় তিনি একই সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম, সব দিকেই জড়িত থাকতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু সেজন্যই তিনি সক্রিয় রাজনীতি কখনই করেন নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওপরে তাঁর সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তিনটি পথ নিয়েছিল, (১) বিধান তান্ত্রিক আন্দোলন—প্রতিবাদ জানান, দরখাস্ত করা ইত্যাদি যার পদ্ধতি, (২) বল-প্রয়োগ—বোমা, রিভলবার যার উপায়, আর (৩) অহিংস সত্যাগ্রহ, যা বাংলা দেশের নীল চাষীরা প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেছিল; যে পদ্ধতি গান্ধীজি সংস্কার করে পুনঃপ্রয়োগ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ওপরে। "I can testify to his sorrow at the discovery by the police of the bomb factory at Muraripukur in the outskirts of Calcutta and the consequent arrest of the workers there. 'Have the police been able to arrest all the members of the party ?' Was the question he asked me with deep concern when he learnt of the police search and subsequent arrests."

মুরারিপুকুরে (মাণিকতলা) বোমা তৈরির কারখানা যখন পুলিস আবিষ্কার করে তখন প্রফুল্লচন্দ্রের দুঃখ-দুশ্চিন্তা ভরা জিজ্ঞাসা, —"হ্যাঁরে, পুলিস কি ওদের সবাইকেই ধরতে পেরেছে ?"

প্রভাতচন্দ্র লিখছেন,—"আচার্যদেব...মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কেন অংশ গ্রহণ করলেন না, অনেকের কাছেই আজও এটা একটা প্রশ্ন! কিন্তু আমরা বিশেষভাবেই জানি যে, যে শিক্ষা-বিস্তার, শিল্পের প্রসার ও লোকহিতসাধনের ব্রতকে তিনি জীবন সাধনা করেছিলেন, রাজনৈতিক আবর্তে তা ব্যহত হতে পারে—এই আশঙ্কাতেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ

দেন নি। কিন্তু সর্বদাই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগাযোগ ছিল।"

১৯৩০ সালের পর থেকে গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার ও জেলে পাঠান শুরু হয়। দেখা যাচ্ছে, এই সময় থেকে বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য জায়গাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সমিতিতে প্রফুল্লচন্দ্র পৌরোহিত্য করছেন। ইংরেজ কিন্তু তাঁকে কখনও জেলে পাঠায় নি। তিনি কখনও উগ্রনীতির প্রচার করেননি। সরকারী খাতায় অবশ্য তাঁর নাম ছিল,—revolutionary in the garb of a scientist,—তাঁর আশ্রয়ে বহু সন্ত্রাসবাদী গা ঢাকা দিয়ে বহু দিন কাটিয়েছে; পুলিস একেবারে জানত না, তা নয়।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান,—'ইংরেজের স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্ররা বেরিয়ে এস', প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু কখনও সমর্থন করেন নি। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আহ্বানে স্যার আশুতোষ ও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজকে পরিত্যাগ করে যান নি। যেমন ১৯০৫-এর আন্দোলনের সময়ে ছাড়েন নি প্রেসিডেন্সী কলেজের সরকারি চাকরী। যদিও তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন।

গান্ধীজির রাজনৈতিক কর্মসূচীর সবটুকু তিনি কখনও সমর্থন করেন নি, যেমন—খিলাফৎ আন্দোলন। আলিগড়ের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার কনভোকেশনের বক্তৃতায় তিনি খোলাখুলি-ভাবেই খিলাফৎ-এর বিরুদ্ধে বলেন—India must not be a spoke in the *Khilafat* wheel gyrated from Istanbul. The *Swaraj* of India must be our one all compelling goal and everything else must be kept in its place.

॥ সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ও প্রফুল্লচন্দ্র ॥

অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে আসেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কর্মসূচীতে আগ্রহী হন। তিনি

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন মুখ্যত ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে। সুতরাং সমাজ সংস্কার ও প্রগতিশীল কাজে তাঁর উৎসাহ আজীবন। প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে তিনি বলছেন,—All the social evils we suffer from must be removed. The course of untouchability more than anything else stands in the way of our nation-building....we must draw into our bosom the so called depressed classes and make them feel that we are at one with them. Hinduism in the old days was liberal and tolerant and never failed to assimilate new ideas and sea voyage was never prohibited. The disruptive tendencies and elements of orthodox Hinduism must be eliminated. The temple of Jagannath knows no distinction of caste. May I enquire if the whole of India is not included within the jurisdiction of Jagannath, the Lord of the Universe? Why should a cordon be drawn round the temple? The doctrine which the prophet of Nadia preached knows no distinction of race, caste and creed. We must assimilate new ideas and march with the times.

"জগন্নাথ জগৎপতি, তাঁর মন্দিরে জাতিভেদ মানা হয় না। দেশের অন্যান্য অংশ যদি জগন্নাথের অধিকারভুক্ত থাকে তবে অন্যত্র জাতিভেদ মানা হবে কেন? অতীতে হিন্দুধর্ম সংকীর্ণ ছিল না, সমুদ্রযাত্রায় যেমন অতীতে কোন নিষেধ ছিল না। বর্তমানে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অতীতে জাতিভেদের গোঁড়ামি বিশেষ ছিল না।

নদীয়ার শ্রীচৈতন্য তাঁর বাণীতে কোথাও 'জাত-পাত'-সম্প্রদায়গত বিভেদ স্বীকার করেন নি।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'প্রবাসী' পত্রিকায়,—'জাতিগঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে' (পরে চক্রবর্তী চ্যাটার্জি কোং পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে)। 'বিকাশ' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯), ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন, 'অস্পৃশ্যতা ও জাতিগঠনের অন্তরায়।' ফরিদপুরে 'হিন্দু মহাসভার' অষ্টম অধিবেশন হয়, ১৯২৪'এ। তিনি আহ্বায়ক সমিতির সভাপতি হিসেবে বলেন,—'আর্য' ব্রাহ্মণের মধ্যেও দ্রাবিড়, শক, হুণ প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট হামেশাই লক্ষ করা যায়। তাহলে জাতিগত বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা কেন মানা হবে? তিনি বিশেষ করে বলেন, নিগৃহীতা নারী, যারা অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় পতিতা হিসেবে গণ্য হয়েছে তাদের সসম্মানে সমাজে পুনর্বাসিত করা দরকার।

পাতিত্য সমস্যা নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস থেকে প্রচার করেন 'জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা'। ঐ বছরেই ২১শে মার্চ খুলনা পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয় সমাজ সভায় সভাপতির ভাষণে বলেন,—পাতিত্য সমস্যা দেশের জ্বলন্ত সমস্যা, এর সমাধান করতেই হবে।

১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে ফরিদপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। গান্ধীজিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে সমাজ-শাখার সভাপতি হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন,—"কুকুর বিড়াল আঁস্তাকুড় থেকে এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে আমাদের মনে কোন নীচ ভাব জাগেনা, তথাপি অনুন্নত শ্রেণীকে আমরা চিরদিনই অধম ও ঘৃণ্য মনে করে পদদলিত ও একঘরে রেখে সমাজকে সব দিক থেকে দুর্বল ও ঘুণ ধরবার ব্যবস্থা করেছি।"

"নিজের অর্থ দিয়ে প্রতি বৎসর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে খুলনার অত্যন্ত অনুন্নত মুসলমান-প্রধান গ্রামে পারিতোষিক বিতরণ উৎসবের সৃষ্টি করিতেন। সেই উৎসব পর্বে নব প্রাণের সাড়া পড়ে

যেত। হাজার হাজার লোকের সমক্ষে খোলা মাঠে মাইকের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন একেবারে পাগলের প্রায়”—(নিমাইদাস রায়চৌধুরী)।

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে বিবেকানন্দের চরিত্র ছিল আদর্শ মানুষের চরিত্র। বহু জায়গায় তিনি বিবেকানন্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি বক্তৃতায় বলতেন,—স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী: 'হিন্দুর ধর্ম এখন রান্না ঘরে ভাতের হাঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছে'। তিনি বলতেন,—'দেখ, স্বয়ং বিবেকানন্দও ব্রাহ্মণ বংশে জন্মান নি'। যীশু সূত্রধরের সন্তান, কবীর জোলার বংশে জন্ম নিয়েছিলেন, রবিদাস ছিলেন চর্মকার পুত্র,—কিন্তু সেজন্য তাঁদের 'সন্ত' হওয়া অসম্ভব হয় নি। বিভিন্ন বক্তৃতায় জাতীয় অগ্রগতির বাধা হিসেবে যে ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ প্রথা দেশবাসীকে মানসিক শৃঙ্খল পরিয়ে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে প্রফুল্লচন্দ্র বার বার এসব কথা শুনিয়েছেন।

শিক্ষা বিস্তারের কাজে আজীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, দান করেছেন অজস্র,—নারী শিক্ষার বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। তরুণদের অকারণে সহরমুখী হ'তে না দেবার জন্যে মফঃস্বলে শিক্ষা-কেন্দ্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি ছিলেন পরম পক্ষপাতী। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর মাত্র ৩৯ বছর বয়স, তখনই তিনি একটি 'ট্রাষ্ট' তৈরি করে তাঁর অর্জিত ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাষ্টের হাতে দেন। 'এডুকেশন সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে খুলনা জেলার নিরক্ষরতা দূর করবার চেষ্টা করেন। রাড়ুলি গ্রামে প্রায় ৫০ বিঘার ওপর, কপোতাক্ষ-তীরে, একটি বিরাট স্কুল আছে; এর সৃষ্টির পেছনে প্রফুল্লচন্দ্রের দান ও প্রচেষ্টার পরিমাণ অপরিমেয়।

"১৯২৮ কি ১৯২৯ সালে বাগেরহাট কলেজ স্থাপিত হয়; অট্টালিকা নয়—ছেঁচার বেড়া—গোলপাতার ছাওয়া বিরাট ছাউনী। অনাবৃষ্টির সময়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে পঠন-পাঠন, বৃষ্টি এলে ছাউনিতলে আশ্রয় গ্রহণ, এইভাবে হল সূত্রপাত। তাঁর নামে ও প্রেরণায় বিশিষ্ট আদর্শ-চরিত্র শিক্ষাব্রতী কামাখ্যাচন্দ্র নাগ মহাশয়

দৌলতপুর কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন বাগেরহাটে, অধ্যক্ষরূপে।...সে কি দুর্দিন গেছে। অধ্যাপকদের নিয়মিত মাহিনা নাই,—ছাত্রদের দেওয়া যায় না ঠিকমত আশ্রয়। সকলে যেন আচার্যদেবের যাওয়ার দিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। তিনি গেলে সবাই টাকা পাবেন কিছু কিছু—এই ভাব। তিনি গিয়ে আরম্ভ করতেন তাঁর শিশুসুলভ অনাড়ম্বর, সরল কৌতুক। টাকা হাতে নিয়ে দুহাত মুঠ করে বলতেন.—"বল, কোন হাতে টাকা—কোন হাত ফাঁকা, কোন্ হাত নেবে?'—তারপর হাঃ হাঃ করে হাসি।"

আমরা বলেছি (৫২ পৃঃ) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের জন্যে প্রথম বই লেখেন 'সরল প্রাণী বিজ্ঞান'। 'অধ্যয়ন ও সাধনা' লেখেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে (মডার্ন পাবলিশিং হাউস)। ছাত্র হরগোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে একত্রে লিখেছিলেন 'খাদ্য বিজ্ঞান' (চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, ১৯৩৬)। বিশ্বভারতী প্রকাশ করেন 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' (১৯৩৭)। এছাড়া শিক্ষা বিষয়ে এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ ছাপা হয় নানান পত্র পত্রিকায়, বাংলায় ও ইংরেজিতে। 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯০৬), 'National Education on National lines' (Modern Review ১৯০৭), 'শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি কথা' (প্রবাসী, ১৯১৭), 'Indian Education, Statement before the Royal Commission Public Service' (G. A. Natesan Co, ১৯১৮), 'রাসায়নিক পরিভাষা' (সাহিত্য পরিষদ, ১৯১৯), 'শিক্ষা ও সেবা', (প্রবাসী, ১৯২১), 'দেশী রং' (চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি, ১৯২২), 'বাঙ্গলা ভাষায় নতুন গবেষণা' (মাসিক বসুমতী, ১৯২২), 'রসায়ন শাস্ত্র, নব্য ও প্রাচীন' (মাসিক বসুমতী, ১৯২২), 'লাভসিয়ের ও নব্য রসায়ন শাস্ত্রের 'উৎপত্তি' (মাসিক বসুমতী, ১৯২২), 'সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা', 'সাধনা ও সিদ্ধি' (প্রবাসী ১৯২২), 'Makers of Modern Chemistry', (Dacca

University Press, ১৯২৫), 'প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে' (প্রকৃতি, ১৯২৪), 'প্রকৃতির আহ্বান' (প্রকৃতি, ১৯২৫), 'বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ধারা' (বসুমতী, ১৯২৫) 'President's address at the All Bengal College and University Teachers' Conference,' Calcutta, ১৯২৬ ; 'সুন্দরবনের গণ্ডার ও বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন' (প্রকৃতি, ১৯২৬); 'অক্সিজেন ও তাহার আবিষ্কার' (প্রকৃতি, ১৯২৬) ; 'ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য' (ভারতবর্ষ, ১৯২৯), 'ডিগ্রীর অভিশাপ' (ভারতবর্ষ, ১৯২৯), 'পাঠাগারের ব্যবহার' (মাধবী, ১৯৩০), 'বর্তমান যুগ সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য' (বঙ্গবাণী, ১৯৩২), ইত্যাদি। এ ছাড়া বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি আহূত হয়েছেন সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে।

শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান আমরা সংক্ষিপ্তাকারে বলতে পারি ;—

(১) শিক্ষার বাহনে মাতৃভাষার অগ্রাধিকার। তিনি নিজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ ভক্ত, কিন্তু তবুও দেশের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি রসায়নবিদ্যায় পরিভাষার ওপরে বই লিখেছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সম্মেলনে' বলছেন,—(অনুবাদ) "জীবনের শিক্ষাদানকালের অর্ধেকটাই যদি চলে যায় বিদেশী একটি ভাষা শেখাতে তবে তথ্য (facts) শেখাব কবে ? আমি একবারও বলছি না যে কোন একটিও বিদেশী ভাষা না শিখলেও আজকালকার দিনে ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু একথা সত্য 'বিশেষজ্ঞ' (Specialists)-দের জন্যে। প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যাবলী ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান মাতৃভাষাতে সম্ভব ; এমন কি বিশেষজ্ঞদেরও বিদেশী ভাষার প্রায়োগিক কৌশলটুকু শিখলেই যথেষ্ট। জার্মানীতে তো দেখেছি শিক্ষিত লোকেরা অনেক সময়ে একাধিক বিদেশী ভাষা

জানেন, কিন্তু শিক্ষাদানের জন্যে মাতৃভাষাকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা।"

১৯৩৩ সালে ডায়েরি'র একটি লিখন—"August 28, 1933 সকাল বেলাতেই কানে ইংরেজি আওড়ানো পৌঁছিল—ছেলেগুলোর এই torture কেবল ইহাদের guardian-দের নির্বুদ্ধিতার ও অপরিণাম দর্শিতার ফল। Moral—চাকরী উপজীব্যই ইহার মূলীভূত কারণ ; hence শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়।

"ভূষণ বলে গলায় ফাঁস"।

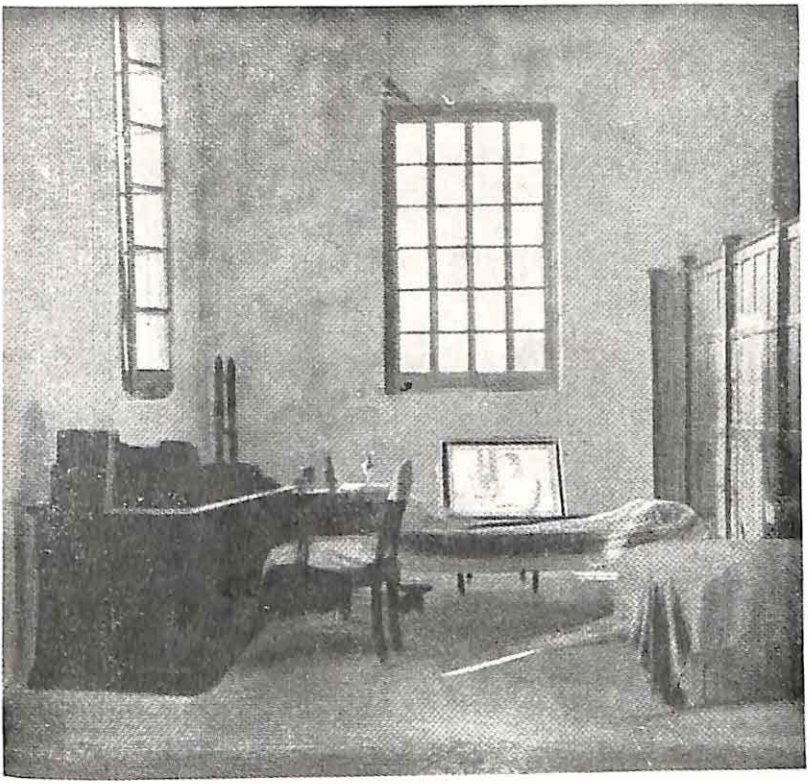
তাঁর মতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার বয়স হচ্ছে ১২ থেকে ১৪, তার আগে নয়।

(২) পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস সম্বন্ধীয়।

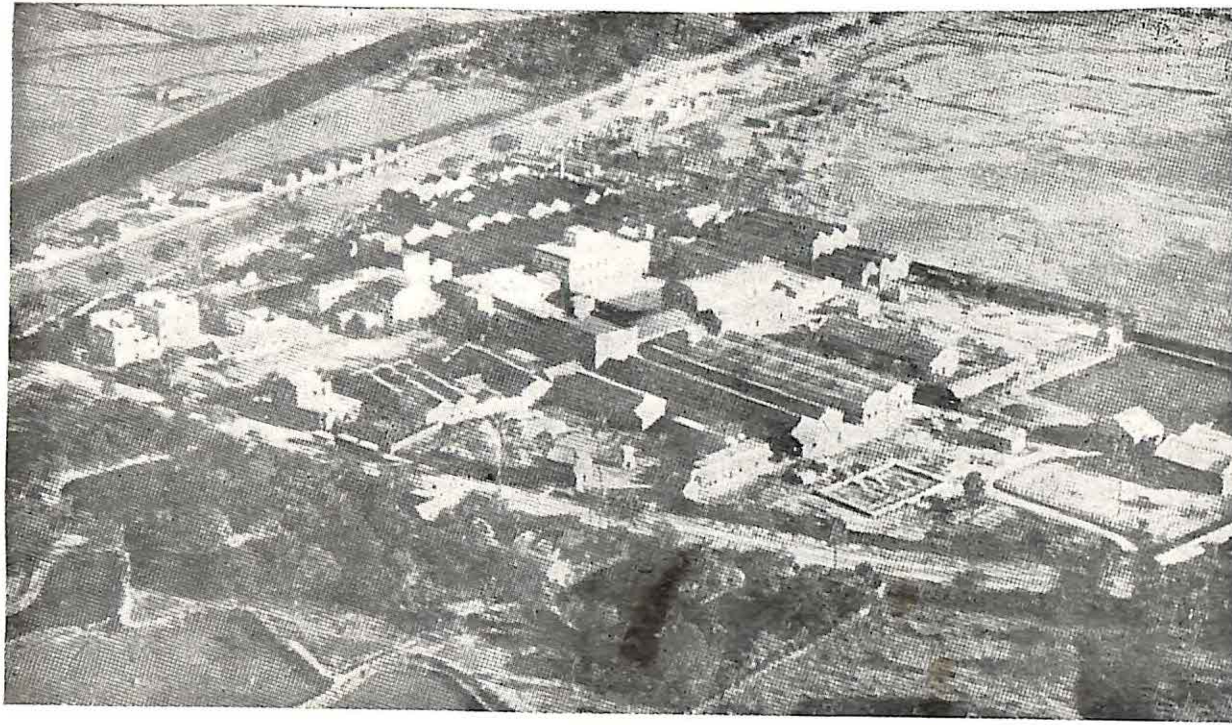
ছাত্রদের কেবলমাত্র পাঠ্য কেতাবটি পড়তে দেখলে উনি খুব রাগ করতেন। তিনি নিজের ছাত্রদের বলতেন ক্লাশে দেওয়া 'নোটের' ওপরে বেশি নির্ভর করতে কারণ মাষ্টারমশাই নানান উপযুক্ত বই ঘেঁটে তবে পড়ান। 'টেক্‌স্‌ট বই' কি হবে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—Make a bonfire of it, if you have already invested your money in any, but simply follow my lectures.

প্রফুল্লচন্দ্র, এমন কি, ধরাবাঁধা সিলেবাসের মধ্যেও নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। এক সময়ে কেমিস্ট্রিতে আই. এস. সি. ও বি. এস. সি'র ফলাফল প্রেসিডেন্সীর বেশ খারাপ হল, পর পর দু' তিন বছর। তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন H. R. James. জেমস্ সাহেব প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন কেন রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সাফ জবাব,—"কারণ আমরা ছাত্রদের 'কেমিস্ট্রি' শেখাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস শেখাই না।"

তিনি 'টেক্‌স্‌ট বুক' যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনই ছক-বাঁধা 'নোট' মুখস্ত করাও পছন্দ করতেন না,—পছন্দ করতেন না



বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যে ঘরটিতে থাকতেন।



বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার (বাগমারি) কারখানার ১৯৫০ সালের ছবি (বিমান চিত্র)।

তথাকথিত ডিগ্রি-বৈতরণী পারের মাঝি 'হেলপ্ বুক,' 'ডাইজেস্ট' ইত্যাদি। টেক্স্ট বুক মুখস্ত করা ছাত্রেরা গণ্ডির বাইরে গেলেই একেবারে অজ্ঞ। প্রফুল্লচন্দ্র বলছেন,—If you complain to my graduate friend about his lamentable deficiency in intellectual equipments, he simply retorts by saying—'But, Sir, it was not in any of our prescribed text books'...It is for the teacher to create a love of study in his pupil, বলছেন,—"টেক্স্ট বুকও তো আজকাল দরকার হচ্ছে না দেখি ; 'aid,' 'digest', 'compendium' এই সব শয়তানী চলছে,—তার সঙ্গে ঘুষ, 'tips' !"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই তিনি বলতেন সম্পূর্ণ ভুলে ভরা। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়' কখনই সেকেণ্ডারি স্কুলের বৃহত্তর অর্থাৎ পরবর্তী উঁচু ধাপের কিন্তু একই ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুক্ত চিন্তার স্মৃতিকা গৃহ; সেখানে কতকগুলো ছকে ফেলা ক্লাশ লেকচার আর সিলেবাস মাফিক পাঠ্যপুস্তক সম্বল-করে ডিগ্রি লাভ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার কথায় বলছেন,—"ছাত্রদের জীবনের ছয় থেকে সাতটি অমূল্য বছর চলে যায় একটি বিদেশী ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়ত্বের চেষ্টায়। উদ্দেশ্য কি, না ঐ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানলাভ। এ ধরনের বিকৃত চিন্তা কোন দেশে আছে বলে মনে হয় না। এ কি কল্পনা করা যায় যে ইংরেজের ছেলেকে পারসী বা চীনা অথবা জার্মান কিংবা রাশিয়ান শিখতে হচ্ছে, ওদের একটির মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করবার জন্যে। ভারতবর্ষেই এই অস্বাভাবিক উপায় আমরা বেছে নিয়েছি আর অস্বাভাবিক মূল্যও দিচ্ছি সেজন্যে।

ডিগ্রির মোহ তিনি ভীষণ ঘৃণা করতেন, তা সে কি বিদেশী,

কি স্বদেশী। 'জিতেন' রক্ষিত তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার বলে তিনি গর্ব করতেন। জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁর হাতেগড়া অসাধারণ রসায়নবিদ্। অন্ততঃ ৪০টি মূল্যবান 'পেপার' রয়েছে তাঁর। এই জিতেন রক্ষিত ছিলেন বি. এস. সি. ফেল করা ছাত্র। বড় হবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির দরকার নেই। প্রফুল্লচন্দ্র গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ. কেশবচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উদাহরণ দিতেন। বার্নার্ড শ'র কলেজী শিক্ষা ছিল না, মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন হাম্‌ফ্রি ডেভি'র ল্যাবরেটরি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। তিনি লিখছেন,—A university degree is rather a disqualification and a handicap in the way of success in life as far as trade and business is concerned.

তিনি বলতেন.—শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ চাই, শিক্ষা সর্বসাধারণে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষালাভের জন্যে ধনী পুত্র হওয়া অত্যাবশ্যক—এ ধারণাকে দূর করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে বিপুলকায় বাড়ি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের, ৩/৪ হাজার টাকা মাইনের ভাইস চ্যান্সেলর সেখানে রাজত্ব চালাবেন,—ছাত্রদের টাকা খরচা না করলে 'ইউনিভার্সিটি এডুকেশন' (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা) জুটবে না, প্রফুল্লচন্দ্র এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলছেন,—Even now, if I am informed aright, in Cairo some three to four thousand pupils take their lessons from their teachers squatted on the floor covered with mats. This ideal we must uphold ; Oxford and Cambridge with their costly appertenances will not do for us; in the rage for forms and furniture and machinery, we must not lose the substance. অর্থ,—"যদি আমার জানা সঠিক হয় তবে এখনও 'কাইরো'তে তিন-চার হাজার ছাত্র মাটিতে মাদুর বিছিয়ে বসে গুরুর কাছে

পাঠ অভ্যাস করে। আমাদের ঐ আদর্শ নিতে হবে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মহার্ঘ জাঁকজমক আমাদের দরকার নেই। চেয়ার-টেবিল যন্ত্রপাতির মোহে পড়ে আসল ব্যাপারটি আমরা হারিয়ে না ফেলি।" তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে স্বাধীন জীবিকার ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। ডায়েরির অংশ : "September, 1933, B. Com.—স্বেচ্ছাকৃত ফাঁদে পা দেওয়া আত্মপ্রতারণা। ডালওয়ালা ও ভুণিওয়ালা কত টাকা লুট করে—ইতরশ্রেণীর মধ্যে সে ভাবে পর্দা নাই—জেলেনী ও তরকারি বিক্রিওয়ালী।..." তবে,—In England, education has been a part and parcel of general progress and culture—it has been a sort of original growth so to speak (cf. Trandej's Carlyle). Whereas in India western education has been synonimous with securing the loaves and fishes in the official hierarchy.

১৩

॥ ১৯৩৬—১৯৪৪ শেষের কয়েকটি বছর ॥

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাস্থ্য তো কোনদিনই তেমন ভাল ছিল না—ছাত্রাবস্থায় কঠিন পেটের অসুখ হয়, আর সারাজীবন অজীর্ণ রোগ ও অনিদ্রা রোগ ছিল তাঁর সঙ্গী। কিন্তু কাজে ছেদ পড়েনি প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিনটি গবেষণাপত্র ছাপা হয়,—'Complex Compounds of Iridium' (Journal of Indian Chemical Society. (সংক্ষেপে...JICS); 'Fluorination of organic compounds', (JICS) এবং 'Synthesis of two biocaptors', (Nature)। দেখা যায়, ১৯২৫ এর পর থেকে স্বয়ং গবেষণা-পরিচালনা কমে গেছে, সহকারী আর ছাত্ররা গবেষণা করছে। ১৯৩৬ সালের পরে গবেষণামূলক ফলাফল নিয়ে 'রিসার্চ পেপার' আর নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর ছাত্র ও 'প্র-ছাত্র' সমগ্র দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 'প্র-ছাত্র' কথাটির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। বিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একবার তাঁকে লিখেছিলেন,—"আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে আপনার ছাত্র না হতে পারা, কিন্তু উপায় ছিল না, কারণ বড় পরে জন্মেছি। কিন্তু আমাকে আপনার 'grand-pupil' বা প্র-ছাত্র বলতে পারেন কারণ আমার রসায়ন শিক্ষক অতুলচন্দ্র ঘোষ (লাহোর দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক) ছিলেন আপনার ছাত্র।" প্রফুল্লচন্দ্র ভাটনগরের 'প্র-ছাত্রত্ব' স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর তখন তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'পালিত অধ্যাপকের' পদ থেকে অবসর নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমেরিটাস অধ্যাপক' হিসেবে থাকবার জন্যে অনুরোধ করল।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও কাজের চাপ যথেষ্ট ছিল। ১৯৩৬ সালে দেখছি তিনি একের পর এক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন,—'অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার', 'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়' (দুটিই 'চক্রবর্তী চ্যাটার্জি' প্রকাশ করে), 'রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার' (প্রবাসী), 'Victor Jacquemont on Rammohun Ray' (Calcutta Review), 'খাদ্যবিজ্ঞান' (চক্রবর্তী চ্যাটার্জি) ইত্যাদি। টাঙ্গাইলে ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে ৬৪-তম অধিবেশনে তিনি ভাষণ দিলেন,—'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়'।

১৯৩৭ সালে গেলেন ওয়ার্ধায়, মারোয়াড়ি এডুকেশন সোসাইটির রজত জয়ন্তী উৎসবের সভাপতিত্ব করতে। গান্ধীজির নেতৃত্বে সেটি ছিল বিখ্যাত এক শিক্ষা-সম্মেলন। নিমাইদাস রায়চৌধুরী লিখছেন —"ওয়ার্ধা যাত্রার পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—ঐ ট্রেনেই ইন্টার ক্লাসে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সপারিষদ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে যাচ্ছিলেন। আচার্য রায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। মধ্য পথের কোন স্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ থামা অবস্থায় আচার্য রায় ইন্টার ক্লাসে প্রবেশ করলেন এবং "Where is Rajendra Prasad, where is Rajendra Prasad ?" বলে তাঁর প্রিয় ছাত্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। ওয়ার্ধায় শেঠ যমুনালাল বাজাজের অতিথিশালায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তিন চার রাত্রি ওয়ার্ধায় কাটে ; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও ঐ অতিথিশালায় ছিলেন। একদিন দেখা গেল আচার্য রায় বালক-সুলভ অভ্যাসে বল্লভভাই প্যাটেলের পিঠের উপর লাফিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলেন, সর্দারজীও বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। ওয়ার্ধায় বিশেষ অধিবেশনের দু'দিন আগে থেকে গান্ধীজি তাঁর চিরাচরিত মৌনব্রত অবলম্বন করেন। অধিবেশনের দিন সকালে পূর্ব ব্যবস্থা মত মহাদেব দেশাই-সহ গান্ধীজির কুটিরে যাওয়া হয়। প্রথম সাক্ষাতেই মহাত্মাজি আচার্য রায়কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন

করেন। তাঁহাকে দুই হাত দিয়ে উঠিয়ে ভূমিশূন্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাড়ি ধরে সোল্লাসে নাড়া দিতে লাগলেন।”

১৯৩৬ সালে ঝাড়গ্রাম রাজের আমন্ত্রণে কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন করতে যান বেলেবেড়ায়। রাত্রে হাতির পিঠে চড়ে বিস্তীর্ণ জলপথ পার হতে হয়। ৭৫ বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সমবায় সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে এই কষ্ট স্বীকার করবার পেছনে যে দেশব্রতের তাগিদ, তা আজ হয়ত মানুষে বুঝতে পারবে না। প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি হেসে বলেছিলেন,—“আমি হচ্ছি ব্যঞ্জন বর্গের বিসর্গ বর্ণীয় ; ক'য়ে বিসর্গ দাও কঃ, খ'য়ে বিসর্গ দাও খঃ গ'য়ে বিসর্গ দাও গঃ। তেমনি আমি বৈজ্ঞানিকের দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রাম-সেবকদের সাথে গ্রামসেবী, অর্থনীতিবিদ্‌দের মহলে অর্থনীতিজ্ঞ।”

ঐ বছরই সুদূর মৈমনসিং জেলার করটিয়ায় গেলেন সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ মহম্মদ ইব্রাহিমের বিশেষ আমন্ত্রণে। সেখানে নদীবক্ষে নৌকার ওপরে কাটিয়েছেন কয়েকদিন। কলেজের পক্ষ থেকে তাঁকে 'জ্ঞান বারিধি' উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালেই বরিশাল গেলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে পৌরোহিত্য করতে। ঐ বছরই নারায়ণ-গঞ্জে যান চিত্তরঞ্জন কটন মিলের উদ্বোধন করতে। এ সময়ে ঢাকায় ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে কিছুদিন কাটান। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা ও শিল্প ব্যবসায়ে কৃতিত্ব', 'বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ',—'বাঙ্গালী তুমি কি ধ্বংস সাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ' (ভারতবর্ষ); 'প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি' (প্রকৃতি); 'বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গালীর আশার কথা' (মাসিক বসুমতী); 'ভাগাড় হইতে চর্মশালা' (প্রবাসী); 'চিড়া, মুড়ি, খই, বিস্কুট' (ভারতবর্ষ); 'দুই বাঙ্গালী কৃতি ব্যবসায়ী, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাধনা

ঔষধালয়) ও আলামোহন দাস (ইণ্ডিয়া মেশিনারী) সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসী'তে।

তাঁর ‘আত্মজীবনী' ও ‘প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাবলী' প্রকাশ করেন চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি।

পাটনায় ১৯৩৭ সালে ‘প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' মূল সভাপতির অভিভাষণ দিলেন—‘বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ'।

বাঙ্গালোরে Indian Institute of Science-এর অধিকর্তা হয়ে তখন গেছেন তাঁর ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। ১৯৩৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে গেলেন,—প্রায় প্রতি বছরই যেতেন। এবারে দুই ছাত্র, প্রফুল্ল গুহ ও জ্ঞান ঘোষের বাড়িতে ভাগাভাগি করে থাকলেন। ফেরবার পথে ঘটল দারুণ বিভ্রাট। প্রবল বন্যায় ভদ্রকের কাছে রেল লাইন ভেঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ। গাড়ি অনেক ঘুরে রায়পুর হয়ে ভদ্রকে যখন পৌঁছল তখন "না-স্নান না-খাওয়া অবস্থা"। চারিদিকে জল। লোকালয়ের চিহ্ন নেই। সঙ্গে কয়েক টুকরো রুটি ও কিছু পুরনো তেঁতুল। তাই খেয়েই কাটিয়ে দিলেন। "এর আগে গাড়ির জানালার চাপে আঙুলটা একেবারে থেঁতলে যায়। সারা রাস্তা জলপটির সাহায্যে উপশমের ব্যবস্থা করা হয়, তাতেও তাঁর মুখের কোন বিকৃতি দেখা দেয়নি।" ১৯৩৮ সালে ‘ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের' রজত জয়ন্তী অধিবেশন হয় কলকাতায়। প্রফুল্লচন্দ্র সে অধিবেশনে যোগ দেন।

বাৎসরিক খুলনা সফরে দৌলতপুরে এলেন ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মে। ১৯৪০ এ একবার উত্তরবঙ্গে সৈদ্‌পুরে যান।

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় University Appointment Board গড়ে তোলেন। বোর্ডের সেক্রেটারি হন দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে Career Lectures নামের কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা দিলেন,—Bengali in Commerce and Industries; বক্তৃতায় ‘আশুতোষ হল' ছিল

জনতার ভিড়ে পরিপূর্ণ,—এই বক্তৃতা অল ইণ্ডিয়া রেডিও সরাসরি প্রচার করে। বক্তৃতায় তিনি বললেন,—The Bengali has got many noble qualities and I am proud of my nationality and I glory in being a Bengali. In one essential aspect, however, he has proved to be a dismal failure, namely in the art of earning livlihood. I have not, therefore, spared any pains to dissect the Bengali character and lay bare its weak points. Like a surgeon I have plunged the lancet deep into the flesh so as to remove the morbid tissue and apply healing balm.…

"…বাঙ্গালী হিসেবে আমি খুব গর্বিত। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্বলতা হচ্ছে যে জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রে সে একেবারেই অকৃতকার্য। সেইজন্যেই বাঙ্গালী চরিত্রের এই দুর্বলতাকে আমি ক্রমাগত উদ্ঘাটন করে দেখাতে চেয়েছি। ডাক্তারের ছুরির মত ক্ষতকে উন্মুলিত করতে খুব গভীরে ছুরি চালিয়েছি আর তারপরে নিরাময়কারী প্রলেপ দিয়েছি।"

১৯৪০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বক্তৃতা দিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে। এই সময়ে ও এর কিছু আগে থেকেই শেক্স্পীয়রের রচনা সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী ঔৎসুক্যের ফলস্বরূপ দুটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন,—The Shakespearean Puzzle.

এই বছরেই সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি উন্মোচনের উৎসবে তিনি বোধহয় তাঁর শেষ জনসম্ভাষণ করেন।

স্বাস্থ্য ক্রমাগতই খারাপ হচ্ছিল। তবুও তাঁর নিয়মমত বিকেলে ময়দানে বেড়ান চলত। ১৯৩৮ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়িতেই যেতেন। ১৯৩৮ এর পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল রোজ বিকেলে একটি মোটর গাড়ি পাঠিয়ে দিত। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে মহাযুদ্ধ বাধল।

সমস্ত দেশ জুড়ে রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া বইছে। তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র সুভাষকে ত্রিপুরী ও রামগড় কংগ্রেসের পরে কোণঠাসা করে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করা হল। ইংরেজের পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করলেন। ১৯৪২-এ গান্ধীজি হঠাৎ Quit India, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ডাকলেন। দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেভাবেই শেষ হোক, ইংরেজকে উপনিবেশ ছেড়ে যেতে হবে। দেশ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু তিনি রুগ্ন, চলৎশক্তিহীন, বৃদ্ধ। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মনুষ্য রচিত দুর্ভিক্ষ মৃত্যুর মত ধেয়ে এল বাংলার বুকে,—এ দুর্ভিক্ষ ত্রাণে আর প্রফুল্লচন্দ্র নেই। আশ্চর্য এই যে দেশের লোকের মন থেকে প্রফুল্লচন্দ্র যেন এসময়ে মুছে গেছেন। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় লিখছেন,—Perhaps the future sociologists and historians would delve into the complex reasons, and try to come up with an answer to the puzzling phenomenon—the swift erosion of the legend. In as short a time as a decade the great P. C. Ray to whom the youth of Bengal rallied was reduced to a frail old man, living almost an obscure life in a room in the Science College.

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা হয়ত ভবিষ্যতে সেই দুর্বোধ্য ঘটনার পেছনের জটিল কারণগুলি খুঁজে বার করবেন, যার জন্যে মাত্র দশ বছরের মধ্যে পি. সি. রায়-রূপী এক কিংবদন্তী হারিয়ে গেল জনমানস থেকে। যাকে ঘিরে একদিন বাংলার যুবশক্তি নবোদ্যম পেত, সে এখন পরিত্যক্ত, একাকীত্বের জীবন কাটাচ্ছে বিজ্ঞান কলেজের একটি ঘরে !

"আচার্যদেব রুগ্ন, শয্যাশায়ী, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না। বিশ্বস্ত ভৃত্য মুরারী মণ্ডল রোজ প্যারাম্বুলেটরে করে বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় তাঁকে ঘুরিয়ে আনে।'

তাঁর ৭০ বৎসর পূর্তিতে বিপুল সম্বর্ধনা তিনি পেয়েছিলেন একদিন; এখন তাঁর ৮০ বছর পূর্তির কোন উৎসবই হল না। ৮১ বছরে একটি অনুষ্ঠান করবার জন্যে মেঘনাদ সাহাকে সম্পাদক করে একটি কমিটি হয়েছিল। সে সমিতি মাত্র ১৬০০০ টাকা তুলতে পেরেছিল। প্রায় সব টাকাই এসেছিল তাঁর পুরনো ছাত্রদের কাছ থেকে; দেশের যে ব্যবসায়ী মহল তাঁকে তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যে বার বার কাজে লাগিয়েছে, তারা তাঁকে প্রায় সম্পূর্ণ ভুলে গেল। কোন অনুষ্ঠান হল না, টাকাটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া হল। কেবলমাত্র তাঁর জন্মস্থান খুলনার কিছু লোক একটি নামমাত্র উৎসব করলেন।

১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন বিজ্ঞান কলেজের ঘরটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

॥ স্মৃতিতর্পণ ॥

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Nature পত্রিকায় স্মৃতিতর্পণ (Obituary) লেখেন অধ্যাপক J. L. Simonsen. তিনি লিখলেন,—By the death on June 16 of Sir Prafulla Chandra Ray at the ripe old age of 83, Indian chemistry has suffered a severe loss. By his own contributions to science, but specially by his personal influence, Sir Prafulla was, more than any one else, responsible for the great development of scientific research in India during the past fifty years. Both at the Presidency College and the University College of Science, Ray built up outstanding schools of research, and nearly all the present professors of chemistry in the Indian Universities have worked in his laboratory. Sir

Prafulla's great activity over so long a period is all the more remarkable since his health was always poor....he devoted most of his income to providing stipends for his research students.

Ray's own researches were concerned mainly with the chemistry of nitrites, and his first notable contribution was his discovery in 1896 of mercurous nitrite. Contrary to the view held previously he showed that the nitrites are not unstable substances and in a long series of papers published mainly in the *Journal of the Chemical Society*, he recorded the preparation of the ammonium nitrite, the alkylammonium nitrite and various other members of the series. Important as were these investigations, it was by the enthusiasm for research with which he inspired his students that he will best be remembered........His passing will be deeply regretted not only by his Indian students to whom he was a true *guru* but also by his many friends in Great Britain.

তাঁর মৃত্যুতে Science & Culture পত্রিকায় (মেঘনাদ সাহা সম্পাদিত) লেখা হল,—With him has been severed the last link of the towering personalities of the last generation, who have made Bengal what it is today, culturally and intellectually, and who, by general consensus of opinion, stand in the front rank of the Makers of Modern India. The outstanding feature of his greatness was that he loved

his people and was one of them. He never thought of keeping himself above and aloof from the common man. He was a soul that disliked to dwell apart from others....In him were harmoniously blended the lofty ideals of ancient oriental culture with the dynamic and progressive aims of the modern rationalistic western civilization....He came with a great mission to serve his country and has left an imperishable example, which will serve as a light and inspiration to the present and future generation. অর্থাৎ– প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিগত প্রজন্মের বনস্পতিসদৃশ্য উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল, সেই ব্যক্তিত্ব যাঁরা মেধা ও কৃষ্টির সমবায়ে বাংলার বর্তমান রূপ দিয়েছেন, এবং যাঁরা ভারতবর্ষের রূপকারদের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সারির। তাঁর মহত্ত্ব, তিনি মানুষকে ভালবাসতেন আর নিজে সাধারণ মানুষদেরই একজন হয়ে থাকতেন। নিজেকে কখনও উঁচু ভাবতেন না, সাধারণ মানুষদের চেয়ে আলাদা ভাবতেন না। তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিল সাধারণ মানুষদের সঙ্গেই। সুপ্রাচীন প্রাচ্য সংস্কৃতির উচ্চাদর্শ ও বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অশান্ত গতিশীলতা তাঁর মধ্যে সুন্দরভাবে মিশে গিয়েছিল...তাঁর জীবনের মহান উদ্দেশ্য ছিল দেশের সেবা করা। যে অবিনশ্বর উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসেবে জাগ্রত থাকবে।

॥ কিংবদন্তীর সেই মানুষটি ॥

অকৃতদার, শীর্ণকায়, প্রগাঢ় পণ্ডিত, কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ, তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, অদম্য কর্মবীর, দেশহিতব্রতী ছাত্র ও মনুষ্যবৎসল ব্যক্তিটি মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন সে আলোচনা এতক্ষণের জীবনী বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তবুও তাঁর কাছের মানুষেরা, তাঁর ছাত্র, বন্ধু, সুধীজন তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কি বলেছেন তা জানতে ইচ্ছা করে।

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁকে কার্লাইলের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করে বলেছেন (Calcutta Municipal Guzette, 1932) যে সেই 'স্কট' জ্ঞানী পুরুষটির বহুবিধ বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে ছিল, আবার রুক্ষ মেজাজী কার্লাইলের তুলনায় প্রফুল্লচন্দ্র অনেক বেশি ক্ষমাশীল, মনুষ্য জাতির বিভিন্ন ক্রটী তাঁকে কার্লাইলের মত অসম্ভব মাত্রায় তিক্ত করে তোলেনি। যদিও দুজনের মধ্যে আপাত মিল যথেষ্ট।

অধ্যাপক F. G. Donnan লিখেছেন (70 th Birthday Commemoration Volume): Sir P. C. Ray, however, has been throughout his life no narrow laboratory specialist...His ideals have always been hard work and practical good in service of his country. Though devoted to the cause of pure science, he had never been the unpractical dreamer in the clouds. But he has never asked much for himself, living always a life of spartan simplicity and frugality—St. Francis of Indian Science.

তাঁর বেশভূষা, খাওয়া দাওয়া, সাধারণ দিনযাপন কত সরল ছিল তার একাধিক বর্ণনা বহুজনে করেছেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন,—"১৯০১ সালে আচার্যদেবকে প্রথম দেখলুম। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। রুটিনে দেখলুম প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের ক্লাস নেবেন। প্রথম দিনের ক্লাস, ছুটতে ছুটতে গিয়ে গ্যালারিতে এসে বসলুম। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল; বেয়ারা এসে রেজিষ্টারি দিয়ে গেল। দেখি বেয়ারার গায়ে চৌখুপি ছিটের সুতির একটা কোট। এবার প্রবেশ করলেন আচার্যদেব। দেখি, তাঁর গায়ে অবিকল সেই ধরনের এক কোট। এটা কেমন করে হল ঠিক বুঝলুম না।

"বিকেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডিমন্সট্রেটর গুপীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন—একটা থান কিনে চারটা কোট করান। দুটো বেয়ারাকে দিয়েছেন. দুটো নিজে পরেন।

"বোম্বাই-এর এক বিশিষ্ট ধনী প্রথম কলকাতায় আসেন। কলকাতার দ্রষ্টব্য বহু স্থান দেখবার পর তাঁর ইচ্ছা হল একবার সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দর্শন লাভ করেন। তিনি খবর নিয়ে জানলেন যে, ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে যে "বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্" আছে, তারই দোতলার ঘরে অধ্যাপক থাকেন। তিনি চলে এলেন। এসে বেঙ্গল কেমিক্যালের দরওয়ানের হাতে তাঁর নামের কার্ড দিলেন। দরওয়ান বলল,—কার্ড দরকার হবে না, আপনি ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলার ঘরে যান, তিনি সেই ঘরেই আছেন।

"ভদ্রলোক গেলেন, কিন্তু তখনই ফিরে এসে দরওয়ানকে বললেন,—ওঘরে একজন দপ্তরী বই জুড়ছে দেখলুম, আর তো কেউ নেই। আচার্যদেবের পরনে ছিল একখানা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি—একখানা বই এর পাতা ছিঁড়ে গেছল, তিনি তখন তাই জুড়ছিলেন।"

তাঁর ৮২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের পরনের কাপড় নিজে হাতে সাবান দিয়ে প্রতিদিন কাচতেন।

'সকালে তাঁর নিজের আহার্য থাকত সাধারণতঃ সিরাপ মাখা মুড়ি। একদিন দুপুর বেলায় গিয়ে দেখি, কুকারে তাঁর জন্যে রান্না হচ্ছে—ভাত, মসুর ডাল ও আলু সিদ্ধ।"

ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পত্নী শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ প্রফুল্লচন্দ্রের অভ্যাস ও খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছেন। অবশ্য যখন তিনি জ্ঞানচন্দ্রের ঢাকার বাড়িতে অথবা কলকাতার বাড়িতে থাকতেন, তখনকার চিত্র।

"আচার্যদেব তাঁর সব কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনায় নিয়ম মেনে চলতেন। সেইজন্যে তাঁর খাওয়া খুব পরিমিত ছিল; কিন্তু তিনি ভালমন্দ খেতে ভালবাসতেন। অতি প্রত্যুষে তিনি এক পোয়া দুধের সঙ্গে চা মিশিয়ে খেতেন, সঙ্গে আধসিদ্ধ ডিম ও পাঁউরুটি থাকত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল তিনি লিখেছিলেন—"চা পান না বিষপান।" তিনি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে দিনে একবার চা খেতেন; দুপুরে হালকা রান্নার তরকারি, মাছ ও দই খেতেন। ভাত নামেমাত্র খেতেন। বিকাল ৪টায় এক টুকরো আপেল, কেক ও মিষ্টি খেতেন। স্পঞ্জ কেক খেতে খুব ভালবাসতেন। আর মিষ্টির মধ্যে ঘরে তৈরি পান্তুয়া খুব পছন্দ ছিল, কিন্তু হজমের দোষ থাকাতে খেতে সাহস করতেন না। তিনি বলতেন, "নিরীহ, নিরীহ! এ খেলে কিছু হবে না।" সন্ধ্যের পর ছোট ছোট আটখানা লুচি (এখনকার ফুচ্‌কার মত) ও একটু আলু পেঁয়াজের তরকারি খেতে ভালবাসতেন।...কুলের আচারের প্রতি ওঁর একটু দুর্বলতা ছিল।...তিনি যখন আমাদের বাড়ি থেকে কলকাতায় যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে নানারকম খাবার করে দেওয়া হত। দেখে শুনে তিনি বলতেন,—"এ যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান হচ্ছে।"

তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে যেখানেই যেতেন, নিজে যৎসামান্য খেতেন, কিন্তু সঙ্গে টিফিন কেরিয়ার একটি যেত, বলতেন ওটিতে খাবার দিয়ে দিতে,—"ছেলেগুলো খাবে!" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন,—"আমাদের দেশের বাড়িতে একদিন ছিলেন। ফেরবার সময়ে জল

খাবার দেওয়া হয়েছে। একখানা চন্দ্রপুলির একটুখানি ভেঙ্গে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন,—এগুলো সব বেঁধে দাও, নিয়ে যাব। সকালে ছেলেগুলো আসে, খুব আমোদ করে খাবে।”

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় দুটি মজার ঘটনার কথা বলেছেন। “চন্দননগরে হরিহর শেঠ লাইব্রেরি করে দিয়েছেন, উদ্বোধন করবেন আচার্যদেব। আমরা সন্ধ্যার আগে পৌঁছেছি, শ্রী শেঠের প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠেছি। আমাদের সঙ্গে আরও একটি ছাত্র ছিল। কতরকম খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু হলে কি হবে, উনি নিজে দু একটা নিরামিষ তরকারি ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না,—আমাদেরও খেতে দিলেন না। শেঠ মহাশয় আমাদের দুঃখ বুঝতে পেরেছিলেন। পরদিন তিনি ব্যবস্থা করলেন, আচার্যদেব আগে খেয়ে নেবেন, পরে আমরা বসব। কিন্তু উনি খেতে বসেই খোঁজ করলেন আমরা কোথায়। যখন বলা হল আমরা পরে খাব, বললেন,—কেন, আমি কি অপাংক্তেয় ? উনি ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন আর এও জানতেন, আমি খেতে খুব ভালবাসি। কিন্তু সেইজন্যেই আমাকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন! বাধ্য হয়ে ফের ওঁর সঙ্গেই বসতে হল,— আমাদের আশা করা চর্ব্যচূষ্য বাদ গেল ফের।”

দ্বিতীয় ঘটনা আরও করুণ। প্রফুল্লচন্দ্রের 'সংসার' চালাত ছাত্রেরা, যারা বিজ্ঞান কলেজে তাঁর সঙ্গে থাকত। জ্ঞান রায় তাদের অন্যতম। একবার মাসের শেষে টাকা পয়সায় টান পড়েছে। আচার্য বলেছেন,—কম খরচায় চালাও। “একদিন এক নামকরা ব্যারিস্টারের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ। তিনি হুকুম করলেন, সবচেয়ে বড় টিফিন কেরিয়ারটা গাড়িতে উঠিয়ে দিতে। উনি তো খাবেন না, আমাদের জন্যে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার আসবে। কিন্তু কপাল খারাপ, যখন ফিরে এলেন দেখি টিফিন কেরিয়ারে মাত্র কয়েকটি লুচি ও গোনা দুটি রসগোল্লা! রাত্রে তো ওনার জন্যেও রান্না হয়নি! আমাকে বললেন, পাশের বাড়ি (মানে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি) রান্নাঘরে গিয়ে বাবুর্চির কাছে চুপিচুপি খোঁজ নিতে, যদি খাবার

দাবার কিছু থাকে। যদি দেখি খাবার আছে, তবেই লেডি বসুর কাছে গিয়ে যেন বলি, খবরদার যেন আগেই লেডি বসু কিছু জানতে না পারেন। কিন্তু কপাল এমনই, বাবুর্চি গোলমাল বাধাল, লেডি বসু এসে দেখলেন অচেনা একটি ছেলে রান্নাঘরে সটান ঢুকে পড়েছে। তিনি আমায় চিনতেন না। তাঁর কঠিন জেরার মুখে সমস্ত ঘটনাটা বলতে হল। তিনি তখনই একটি টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে খাবার নিয়ে নিজেই পা বাড়ালেন সায়েন্স কলেজের দিকে। ইচ্ছে, আচার্য রায়কে বেশ দু'কথা শুনিয়ে আসবেন। আচার্য রায় ঐ রাত্রে স্বয়ং লেডি বসুকে সায়েন্স কলেজে দেখে চমকে গেলেন। আমার দিকে চোখ পাকিয়ে চাইলেন। লেডি বসু বললেন,—'কতদিন আপনাকে বলেছি আপনার খাবার আমার বাড়ি থেকে আসবে, কিন্তু অকারণেই আপনি না না করেছেন। এখন কোন কথা শোনা হবেনা, সব খাবার এবার থেকে আমার ওখান থেকে আসবে।' আচার্যদেব বললেন—'কতকটা ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই আজ খাবার তৈরি হয়নি। এবার থেকে আর ভুল বোঝাবুঝি হবে না। আজকের খাবারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।' পরদিন সকালে আমাকে উনি যাচ্ছেতাই করলেন লেডি বসুকে কষ্ট দেবার জন্যে।"

॥ ছাত্রবৎসল সেই মানুষটি ॥

ছাত্রদের জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল অফুরন্ত ভালবাসা। বাইরে তার প্রকাশ অবশ্য ভ্রূকুটি, গালাগালি, কিল, ঘুঁষি। কিন্তু অন্তরের ভালবাসা ছাত্রদের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার ছিল। যে ছাত্রেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে থাকত তাদের জন্যে তো বটেই, সমস্ত ছাত্রের প্রতিই ছিল তাঁর ভালবাসা। কেউ যদি লম্বা পাঞ্জাবী পরে তাঁর কাছে যেত, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, —কিরে, সেমিজ পরে এসেছিস কেন? কেউ যদি লাইব্রেরির বইকে

অযত্ন করত তার কপালে ছিল দুঃখ। কেউ বেশি বেশি কেমিক্যাল খরচ করলে জুটত তার গালাগালি। কিন্তু কারোর সত্যিকারের কোনও অসুবিধে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

তিনি অসম্ভব রকমের সময়নিষ্ঠ ছিলেন ; কোন কারণেই তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের অদল বদল হত না। (তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ...'বাবাতো' ভাইয়ের জন্যও আমার রুটিন আমি ভাঙবো না— পৃঃ ৮৪) জ্ঞানেন্দ্র রায় লিখেছেন,—একবার বদল হয়েছিল রুটিন। প্রফুল্লচন্দ্রের এক ছাত্র হেমেন্দ্র কুমার সেন সেদিন বিলেতে যাচ্ছেন। তখন ট্রেনে বোম্বাই গিয়ে সেখান থেকে জাহাজে চড়তে হত। জ্ঞান রায় সেদিন ল্যাবরেটরিতে একটি পরীক্ষা করবার জন্যে toluene গরম করছিলেন। ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে, হাওড়াতে হেমেন্দ্রকে see off করতে হবে, তাই সামান্য অসাবধান হতেই toluene এ আগুন ধরে গেল। আগুন বন্ধ করবার চেষ্টা করতে যেতেই জ্বলন্ত toluene গায়ে পড়ে জ্ঞানেন্দ্র সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গেলেন। সঙ্গের সাথীরা তাঁকে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি করে ক্যাম্বেল হাসপাতালে নিয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র তখন বেরিয়েছিলেন। জ্ঞান রায় লিখছেন,— "রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে উনি আমায় দেখতে হাসপাতালে হাজির হলেন। আমি বললাম,—আপনার শুতে রাত হয়ে যাবে, আপনি যান। কিন্তু যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ততক্ষণ উনি হাসপাতাল ছেড়ে নড়লেন না। পরদিন প্রত্যুষে আবার হাসপাতালে এসে হাজির। তার মানে ওনার রুটিনের দফারফা। ওঁকে বললামও সে কথা। উনি কান দিলেন না।"

তাঁর অন্যতম ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রবৎসলতার উদাহরণ স্বরূপ যে ঘটনাটির কথা লিখেছেন[১] সেটির সবিস্তারে পুনরুল্লেখ করা দরকার মনে করছি।

১। Sir P. C. Ray Birth Centenary Souvenir Volume, Calcutta University.

"দীর্ঘদিন আচার্যদেবের সঙ্গে কাটিয়েছি। তাঁর অসীম স্নেহ উপভোগ করেছি—দেখেছি মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র—বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র, দেশহিতৈষী প্রফুল্লচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড়। ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আচার্যদেবের সঙ্গে বাঙ্গালোর যাচ্ছিলাম। রিজার্ভ-কুপে, তাই অন্য কোন যাত্রী সে গাড়িতে নেই। অন্য দুইটি বিভিন্ন কামরায় ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আর স্বর্গীয় ডাঃ প্রমথ ব্যানার্জি। সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মেলে হাওড়া থেকে রওনা হলাম—রাত্রের খাবার সঙ্গে ছিল, যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুম দেওয়া গেল। পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে ১০/১৫ মিনিটের জন্য গাড়ি থামল, আচার্যদেব প্ল্যাটফরমে নেমে পায়চারি করছেন—ডাঃ মুখার্জি আর ডাঃ ব্যানার্জিও তাঁর সঙ্গে। আচার্যদেব শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে বললেন—আমার দুপুরের খাবারের একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আচার্যদেবের নিজের জন্য কিছুই দরকার ছিল না, তবে আমার জন্যই তাঁর যা কিছু দুশ্চিন্তা। শ্যামাপ্রসাদ বাবু সঙ্গে সঙ্গে গার্ডকে ডেকে বলে দিলেন একটা মিল যোগান দিতে। যথাসময়ে মিলটি পেলাম এবং খাওয়া হয়ে গেলে রেলের লোকেরা এসে টিফিন কেরিয়ারটি নামিয়েও নিয়ে গেল। বেলা একটা আন্দাজ আচার্যদেব বললেন—"ওরে এইবেলা শ্যামাপ্রসাদকে বলে আয় রাত্রের খাবার একটা ব্যবস্থা যেন করে রাখে।" গার্ডকে দেখে তাকে বলে দিলাম রাত্রের খাবারের কথা এবং গার্ড জানাল যথাসময়ে আমাদের খাবার টিফিন কেরিয়ারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হবে। আচার্যদেব এতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। আরও তিন চার বার তিনি আমাকে বললেন—"যা শ্যামাপ্রসাদকে বলে আয় তোর খাবার কথা।" অবশেষে আমি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম—"দেখুন আমার তিরিশ বছর বয়স হল। আমি বিজ্ঞান কলেজে চাকরি করি। আমি যেয়ে ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বলব—আপনি দয়া করে আমার রাতের খাবার ব্যবস্থা করুন—এটা কি করে হয়?—বিশেষ আমি তো গার্ডকে বলেছি এবং গার্ড ব্যবস্থা

করবেন জানিয়েছেনও।" আচার্যদেব আর দ্বিতীয়বার এ সম্বন্ধে কোন কথা তুললেন না। ব্যাপারটা মিটে গেল দেখে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

"বেলা ৪টা আন্দাজ পিট্টাপুরম ষ্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমাকে কি একটা কাজের ফরমায়েস দিয়ে আচার্যদেব প্লাটফরমে নেমে পড়লেন পায়চারি করতে—এগিয়ে চললেন পিছন দিকে প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। আচার্যদেব যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন তখন হঠাৎ একটা হুইশ্‌ল্‌ দিয়ে গাড়ি দিল ছেড়ে, আচার্যদেব রইলেন প্লাটফরমে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ হঠাৎ পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে কামরার পা-দানিতে দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝুলতে লাগলেন। আমি হতভম্ব! তাড়াতাড়ি আচার্যদেবকে টেনে ধরলাম যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। সারা প্লাটফরমের লোকজন হাঁ-হাঁ চিৎকার করে উঠল। কয়েক গজ এগিয়ে ট্রেন গেল থেমে।

শ্যামাপ্রসাদবাবু, ডাঃ ব্যানার্জী ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় ঢুকলেন এবং আচার্যদেবকে বললেন—"এ আপনি কি করছিলেন?" আচার্যদেব দম নিয়ে বললেন,—"জান, আমি খুলনা জেলার লোক, ছোটবেলা তর তর করে নারকেল গাছে চড়তাম। তাছাড়া একবার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে যাচ্ছিলাম, সেবার এইরকম হাতল ধরে ঝুলে প্রায় ৩/৪ মাইল গিয়েছিলাম।" শ্যামাপ্রসাদবাবু অনুযোগ করলেন, "কিন্তু কেন এ risk নিচ্ছিলেন? এটা অত্যন্ত অন্যায়" ইত্যাদি। আচার্যদেব চুপচাপ সব অনুযোগ হজম করছিলেন। হঠাৎ বললেন: "কি জান—এই ছেলেটার জন্য; রাতের খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য তোমাকে যেয়ে বলতে ওর লজ্জা করে—উনি রাতে উপোস করবেন তবুও লজ্জায় তোমাকে বলবেন না—রাত-উপোসে হাতি শুকোয়—এটা ওকে কিছুতে বোঝাতে পারলাম না।"—তখন লজ্জা পেয়েছিলাম; আজ ভাবি, কি স্নেহ, কি অনুকম্পা, কত বড় এই হৃদয়!" যতীন্দ্রনাথ রায় লিখছেন,—"Acharya Ray was

very soft in heart. After the death of my youngest uncle who predeceased him I went barefooted to see him...On seeing me barefooted he asked me the reason of it. As soon I broke the sad news, he burst into tears and embracing me cried aloud like a boy saying: "Purna passed away before me?" He was then in a bad state of health. It was with great difficulty that I consoled him."

॥ স্পষ্টবক্তা সেই মানুষটি ॥

স্নেহপ্রবণ, কোমলপ্রাণ সেই মানুষটির মধ্যে ছিল অত্যন্ত ঋজু একটি নৈতিকবোধ, যা তাঁকে বহুক্ষেত্রেই কঠিন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপকারী স্পষ্ট বক্তার ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিত। এর সহস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ ও পুস্তিকার পাতায় পাতায়, যেখানে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকেই তিনি ন্যায় সঙ্গত ভাবেই বারবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। যেমন তাঁর জীবনের গোড়াতেই তিনি ইংরেজ শাসককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন India Before and After Mutiny গ্রন্থে। "বাঙ্গালী তুমি কি ধ্বংসসাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ?"—(ভারতবর্ষ, ১৯৩৭) তাঁর কঠিনতম ভর্ৎসনা বাঙ্গালীর প্রতি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টরদের তিনি কিছু স্পষ্ট কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অপরিণামদর্শিতার ভয়াবহ দুরবস্থা যা অবশ্যম্ভাবী। এ প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করেছি ১১শ পরিচ্ছেদে।

১৯৩৫ সালে প্রিয় ছাত্র মেঘনাদ সাহাকে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি,—"...আমাদের বাঙ্গালীর জাতিগত দোষ এই যে কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে কিছুদিনের জন্য জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু আবার অহিফেনসেবীর ন্যায় ঝিমাইতে থাকে এবং ঘুমাইয়া পড়ে।

…এই College of Science-এর কল্যাণের জন্য একা Palit ও Ghosh যাহা দিলেন তাহাই first and last. কত উচ্চপদধারী আছেন, যথা ঃ High Court, District & Session Judges, Dy. Magistrates, Munsiffs and Secretariat High Officials, Vakils and Doctors—ইঁহারা প্রত্যেকেই কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের নিকট অশেষ ঋণী। কিন্তু কেহই একমাসের মাহিনা পর্যন্ত আমাদের দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন নাই। অথচ এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই গৌড়ীয় মঠ, পাবনা সৎসঙ্গ ও শিবপুর বৈষ্ণবাচার্য্যের মঠে অজস্র টাকা বর্ষণ করেন।

"আমি ইদানীং বেজায় ব্যস্ত। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ।....বাঙ্গলার তুর্দশাও সেই প্রকার। "নিজ দেশে পরবাসী" হইতে চলিল।...সম্প্রতি 'অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়' বলিয়া একখানা বই লিখিতেছি। তাহাতে কেন বাঙ্গালী সর্বক্ষেত্র হইতে জীবন সংগ্রামে হটিয়া যাইতেছে তাহার সবিশেষ আলোচনা করিতেছি।..."

কলকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিল না। কিন্তু সেজন্যে স্যার আশুতোষ তাঁর স্পষ্ট কথা থেকে নিস্তার পাননি। জ্ঞান মুখার্জীকে ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে চিঠিতে লিখছেন, "...বড় জ্ঞানকে লইয়া স্যার আশুতোষ তোলপাড় করিতেছেন। —breach of faith, contract, ethical principles etc. গত শনিবার Governing Body'র মিটিং-এ আমার সহিত exchange of high words হইয়াছে। কারণ তিনি আমাকে মূলীভূত কারণ ধরেন। আমি বলিলাম—"I stand in *loco parentis.* আমার ছেলেদের উন্নতির পথে কাঁটা দিতে পারি না।···" তোমার উপরও দেখিলাম খাপ্পা। যাহা হউক, কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। দরকার যদি হয় আমি Lord Ronaldshay-র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড় জ্ঞানের বিষয় বলিব।...তহবিলের সমস্ত

টাকা অন্যান্য নানা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে। ফল কথা, আশুবাবুর সহিত বনিবনাও হইয়া চলা অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। আমার বোধহয় ক্রমে ক্রমে open revolt দরকার হইবে।"

আবার যখন মদনমোহন মালব্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনেক বেশি সুবিধে দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন মালব্যজি'র মুখের ওপরেই তিনি বললেন,—Bengal is very much in need of poor Dr. P. C. Ray and Pandit Madan Mohan Malaviya has all the qualities of Sir Ashutosh Mookerjee minus his genius.

ছাত্ররা অহরহ বকুনি খেয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু যখন তিনি তীব্র শ্লেষভরে তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলতেন,—Each and everyone of you is a potential murderer of Snehalata—তখন নিশ্চয়ই আত্মগ্লানিতে তাদের কারো কারো মনে হ'ত, ধরণী দ্বিধা হও;—(পণপ্রথার প্রতিবাদে স্নেহলতার আত্মহত্যা সে সময়ে এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁকে অসম্ভব ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল)।

নিত্যানন্দ বসুচৌধুরী লিখছেন,—"একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখাপড়া শিখেছেন, আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। ব্যবসা না করে চাকরি কর্তে এলেন কেন?" "সে অনেক কথা"— আমি বলিলাম, "প্রাচীন জমিদার বংশে আমার জন্ম, অতিথি সেবা, ঠাকুর সেবার ঘর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, বড় ব্যবসা কি তা জানি না। গ্রামে ধান চালের ব্যবসা দেখি। এই ব্যবসা কতকগুলি নিরক্ষর মুসলমান একখানা গরুর গাড়ি আর মাত্র ১০০ টাকা মূলধন লইয়া দখল করিয়া আছে। নিকটস্থ রেলওয়ে স্টেশন আড়তে ধানের যে দর সেই দরে গ্রামে ধান খরিদ করে আর ১০ আনা গরুর গাড়ি ভাড়া দিয়ে ঐ আড়তে বিক্রি করে। তাহারা টেনে ওজন বেশি করে না মাপিলে ঐ ব্যবসা কি করিয়া চালাইবে? ব্যবসা মানে ইহাদের

সঙ্গে আড়াআড়ি করা। টেনে মেপে ওজনে ফাঁকি দিয়ে কাজ করা ৷ আপনি কি একজন ভদ্রলোককে সেই কাজ করিতে উপদেশ দেন ?" যেমন এই কথা বলা, তিনি শুইয়া ছিলেন, রেগে উঠে বসলেন এবং বললেন "তবে মারোয়াড়ি জাতির গোলামী করুন গে।"

আবার বলি, তিনি মোটেই সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু দেশের যে অংশের তিনি প্রতিনিধি, যে অঞ্চলের মানুষের তিনি নিকটাত্মীয়, তাদের দোষত্রুটি, তাদের বৈষয়িক অভাব অভিযোগ নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সর্বাগ্রে এবং এটিই বড় কথা যে কোন তত্ত্বীয় বা আরোপিত জাতীয়তাবাদ বা কৃত্রিম আন্তর্জাতিকতাবাদ তাঁর পরিচিত বৃত্তের রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের অসীম দুঃখের দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে দেয় নি। তিনি বাঙ্গালীর ভাবালুতার, বাঙ্গালীর বাস্তবতা বোধের অভাবের, বাঙ্গালীর আলস্যের বিরুদ্ধে কঠোর স্পষ্ট ভাষণ করেছেন। তিনি মেঘনাদ সাহাকে কিন্তু লিখছেন,—'সায়েন্স এণ্ড কালচার' সম্বন্ধে,— "ইহার Contributors are almost confined to the Bengalees. যাহাতে Northern Indian Scientists attracted হন তাহার বিবিধ চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন বীরবল সাহনী (Lucknow)।" শান্তিস্বরূপ ভাটনগরকে উনি লিখছেন,— You hint at my provincialism, but underneath it there is a bitter cry over the indolence and lack of enterprise of every class of Bengali.··I instance these not out of jealousy but to draw pointed attention of Bengali's ineptitude. For instance, I am writing a short sketch of the career of Seth Ghanasyamdas Birla—how he began at 17 in Calcutta. He is now 41. Within this quarter of a century he, in fact (jointly as Birla Bros.), has built up a magnificent business embracing various

branches.... । মাদ্রাজে তিনি এক বক্তৃতায় বলছেন,—I have not come to Madras in vain if I have been, in any way, instrumental in arousing your activity, however feeble it might be, with reference to this very important question, the progress of Madras and Bengal means the progress of India. As I have said in other places, we are Indians first, and Bengalis and Madrassis afterwards... ।

নিজে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-লালসার, তা কি দেশী বা কি বিদেশী, ঘোর বিরোধী ছিলেন। "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার উপর আচার্য শেষ জীবনে বিশেষভাবে বীতস্পৃহ হন। এ যেন গ্রাজুয়েট তৈয়ারির কারখানা, যন্ত্রদানবের মত বছরের পর বছর হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উদ্গীর্ণ করছে এবং তারা ৩০৲, ৪০৲, ৫০৲ টাকা দরে জীবন বিক্রি করে দিচ্ছে। ...তিনি কলেজী শিক্ষা বঞ্চিত কার্নেগী, ফোর্ড, এডিসন, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেন। দৈহিক শ্রমকে হীনচক্ষে দেখা যে দেশের একটা বড় সর্বনাশ করেছে সে কথা তিনি বার বার বলেছেন"—(শান্তাদেবী)। "সে সময় এম. এ. পাশ এক ভদ্রলোক এসেছেন। নূতন আর একটি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শুনেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে বলে উঠলেন—"Creater created the Bengalees for passing examinations, fulfil his wish." ভদ্রলোক ত একেবারে চুপ" (প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ)।

সোদপুরে একদিন সকালে তিনি নিমকাঠির দাঁতন করছেন। গান্ধীজি দেখে হেসে বললেন,—'আপনি নিজে দাঁতন করছেন, কিন্তু আপনিই তো বেঙ্গল কেমিক্যালে টুথ পাউডার তৈরি করেন।' প্রফুল্লচন্দ্র জবাব দিলেন,—"That is meant for the fools, we manufacture it, otherwise they would use

foreign products."—"গাধাদের জন্যে তৈরি করি, নইলে তারা বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবে।"

বস্তুতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার ও ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে প্রকৃত হিতৈষীর স্পষ্টভাষণ রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের পরে একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের একান্ত গুণগ্রাহী বন্ধু। প্রফুল্লচন্দ্রও নিবেদিতার Civic Ideals প্রভৃতি বই থেকে প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন।

॥ সাহিত্যপ্রেমী, সাহিত্যকার লেখক সেই মানুষটি ॥

শেক্স্‌পীয়র, মিলটন, শেলী, বায়রন, কার্লাইল, ইমারসন প্রভৃতির লেখা তিনি একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন বলা যেতে পারে। Addison এর Spectator-এ "Vision of Miranda" তাঁর শেষ জীবনে তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করত ও বার বার তিনি ওটা পড়তে বলতেন। দিনের সময় ভাগ করে তিনি হাল্‌কা ও গভীর প্রকৃতির সাহিত্য পাঠ করতেন বা শুনতেন। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়েও তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করতেন" (নিমাইদাস রায়চৌধুরী)।

"তিনি বৈজ্ঞানিক হলেও সাহিত্যচর্চা করতে ভালবাসতেন। একদিন শরৎচন্দ্রের 'নব বিধান' পড়তে পড়তে বলেছিলেন—"তুমি এরকম মোচার ঘণ্ট, গাছপাঁঠা, রাঁধতে পার ? সেক্স্‌পীয়রের রচনা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমার ছোট দেওর ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের বিয়ের পর একদিন তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান ও একটি মুখবন্ধ খাম দিয়ে বলেন—"এটি ছোট বৌমাকে দিও।" খাম খুলে দেখা গেল তাতে লেখা আছে—Dr. B. N. Ghosh being of very shy disposition has puzzled many as to how he won his bride. The explanation lies below—

"In Belmont is a lady richly left
And she is fair and, fairer than that word,
Of wondrous virtues ; sometimes from her eyes
I did receive fair speechless messages :
Merchant of Venice."

—(জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পত্নী নীলিমা ঘোষের লেখা থেকে)।

"বাস্তবিকই ইংরাজী ও বাংলাতে তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি সাহিত্যিক হবার জন্যে জন্মেছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে রাসায়নিক হয়ে গেলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি ছিল এবং বহু অমর সাহিত্যের রত্ন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এডিনবরায় যখন তিনি প্রাইজের প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে কথা স্মরণ করে ষাট বৎসর বয়সেও লেখেন "তখন আমার লেখনীর যে অবাধ গতি ছিল আজ তা কোথায় ?"—

(শান্তা দেবী)।

প্রফুল্লচন্দ্রের লেখনীর স্বাদ দেবার জন্যে কোনরকম নমুনার উদ্ধৃতি এখানে দেব না। প্রতিটি বাঙ্গালীর উচিত প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করে পড়া। তাঁর ইংরেজী ঋজু ও স্পষ্ট, তাঁর ক্ল্যাসিক (চিরায়ত) ইংরেজী সাহিত্যপ্রীতির তা প্রতিফলন। তাঁর বাংলা সম্পূর্ণ বাহুল্য-বর্জিত, অনাড়ম্বর অথচ প্রকৃত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ, বার্তাবহ। তাঁর 'ডায়েরি'র পাতায় ছোট ছোট লেখনগুলি পড়লে মনে এক অপূর্ব ভাব জাগে : "১১ই মাঘ, ৬৯ ব্রাহ্মাব্দ, Jan 24, 1899. ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব বিষয় লইয়া অহোরাত্র ব্যস্ত থাকি—আমার সুখের জন্য এটা চাই—ওটা চাই—না হলে চলে না—ছেলেপিলের ন্যায় সদা এই ভাবই পোষণ করি—কাজেই শান্তি পাই না। অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য সেই দিকে মনের গতি ফিরাইতে চেষ্টা করি না। কর্তব্য সাধনে, পরের দুঃখ সাধ্যানুসারে বিমোচনে ব্রতী হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হও। ইহাই প্রকৃত সুখ; জীবনে এমন দুই একটি ঘটনা

ঘটিয়াছে যাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি কৃপাময় ঈশ্বর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পথ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম।"

"April 27, 1922 জীবনটা স্বপ্নবৎ চলিয়া গেল—এখনও স্রোত প্রবাহিত। শীঘ্রই সমুদ্রে লীন হইয়া যাইবে।...."

"Dec 1, 1930 In the art of earning his bread, the Bengali is hopelessly a failure – everyone thrives more – except the children of the soil. In the pursuit of an ideal, he (Bengali) has cheerfully mounted the scaffold, swung from the gallows—has performed prodigious deeds of valour, then again for social service requiring devotion and sustained energy for years, he has not as yet developed any liking or interest."

"I have no sense of success on any very large scale in things achieved. But I have the sense of having worked and of having found happiness in doing so."

"যে নূতন আলোক পায় তাহার দায়িত্ব চুপ করিয়া থাকা।" প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র, শিষ্য ও বেঙ্গল কেমিক্যালের একদা ম্যানেজার রাজশেখর বসু প্রৌঢ় বয়সে পরশুরাম ছদ্মনামে ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় কলম ধরলেন। তাঁর রচনা বঙ্গসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ হয়ে রইল। মুখ্যত তাঁর প্রসঙ্গেই প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,— "...সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গড্ডলিকার" প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পরপর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম,

এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারি একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্টবিষ্টু"। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।··আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে, আর একটি তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? একসময়ে পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে। কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়
শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

সুহৃদ্বর,

বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হলো আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্য-সরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলেছে। খুলে দেখি—যাকে ইংরেজিতে বলে টেবিল-ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক পত্রে ছোটগল্প আর মিলহারা ছন্দের কবিতায় সাহিত্য-লোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বাঁধিয়ে দিতে পারত, এমন কি লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এস. সি কাউকে ডি. এস. সি. লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিক-পত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভূষণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমোর হয়েছে। এমন কি ভাবছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব ; যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটারির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন। কিন্তু আপনার আর উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাই-এর নিয়মে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করা যাবে।

আপনার

১৮ অগ্রাণ ১৩৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁর মৃত্যুর পরে প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণে Nature পত্রিকায় অধ্যাপক J. L. Simonsen অন্যান্য কথার পরে লিখলেন,—His knowledge of English literature was remarkable,

and his tastes *catholic*, ranging from Shakespeare, Milton to "Tom Jones".

॥ উপসংহার ॥

প্রফুল্লচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দেশের প্রচণ্ড এক অশান্ত রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার শেষ চোখে পড়ছে না, যখন দেশের স্বাধীনতা লাভের ঊষালোক পূর্বগগনে তখনও অরুণাভা ছড়ায় নি। এদেশের মানুষ অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে। বাংলার মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ দেশের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রথম সোপানে মানুষের বিবেককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুরনো যুগের বনস্পতিসদৃশ নীতিবান মানুষগুলির আদর্শের অবমূল্যায়ন শুরু হয়ে গেছে সুবিধাবাদের জোয়ারে 'গা ভাসান' আধুনিকতায় উত্তরিত কৃত্রিম সমাজে। সুতরাং বিজ্ঞান কলেজের দোতলায় একটি ঘরে সাধারণ একটি শয্যায় শয়ান মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্যে দেশের জনগণ তখন আবেগমথিত হবার কারণ ও সময় খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর আবার নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করবার আজ একান্ত প্রয়োজন। তিনি সহজ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় কথা বলে গেছেন,—বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের কটাহে মহাকাল যখন সমগ্র বাঙ্গালী যুবমানসকে জ্বাল দিয়ে আকারহীন বুদ্বুদময় করে তুলছে, তখন সমস্ত তত্ত্বীয় 'পাত্রাধার কি তৈল' বিচার বাদ দিয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই উচিত সেই সহজ মানুষটি অর্থনৈতিক উন্নতির কোন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তার আবার খোঁজ করা ও সেই পথে যাত্রা শুরু করা।

একদা দেশের এমন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে তাঁর হাতে গড়া ছাত্রেরা শিক্ষকপদে নেই। কিন্তু গুরুর গুরু আচার্যের শিক্ষা ছাত্রেরা নিল না। এটা-ই বোধহয় বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে বড়

দোষ যে সে সত্যিকারের মহত্ত্বকে চিনতে পারে না, নিজেদের অতিপাণ্ডিত্যে তাকে সর্বদা নীচে নামিয়ে বিচার করে। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের ব্যর্থতার কথা নিজেই লিখে গেছেন,—I have tried my best to bring into relief the glorious defects in our present educational system, which is mainly responsible for the failure of the Bengali.

শিক্ষাব্যবস্থা বদলে বাঙ্গালী ছেলেদের ভাতকাপড়ের সন্ধানে নেমে পড়বার নির্দেশ দিতে যদি বর্তমানের শিক্ষকরা দ্বিধা করেন তবে মহান ভারতীয় জাতির একটা বৃহৎ অংশ, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে আর একটা প্রজন্মকালও লাগবে না। এ ভয়াবহ সাবধানবাণী প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চারণ করে গেছেন।

ঃ নির্ঘণ্ট ঃ

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	প্যারাগ্রাফ	পংক্তি	মুদ্রিতরূপ	শুদ্ধরূপ
৭	২	৫/৬	"ক্যালিফোনিয়া"	"ক্যালিফোর্নিয়া"
১৩	১	৫	জশদীশচন্দ্র	জগদীশচন্দ্র
৩৪	২	শেষ পংক্তি	অমূল্যচরণ	অমূল্যচরণ
৩৯	১	১৪	সুশ্রুত	সুশ্রুত
৪০	৩	৩	সুশ্রুত	সুশ্রুত
৪০	৩	৬	রসায়নর্ণব	রসার্ণব
৪১	২	৩	বার্তেলা	বার্তেলো
৪২	১	৯	অতিশয়	অতিশয়
৪২	৩	১০	হিন্দু	হিন্দু
৫৭	৩	শেষ পংক্তি	সর্বোতোভাবে	সর্বতোভাবে
৭৯	১	শেষ পংক্তি	কৃচ্ছসাধন	কৃচ্ছ্রসাধন
৮৭	৬	১	'আমর	'আমরা
১১৫	৩	৫	Charka +	Charaka +
১৪০	২	২	Guzette	Gazette

অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল-সদস্য, অল ইন্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স অ্যাসো-সিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, রামমোহন লাইব্রেরীর সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হিসেবে বহুদিন কাজ করেছেন, তিনি *Transactions of the Bose Institute* পত্রিকার সম্পাদক-মন্ডলীর সদস্য। নানা পত্র পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক ও সরস রচনার তিনি সুপরিচিত লেখক। তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে রয়েছে *A Students' Biography of Sir J. C. Bose*, বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু, প্রভৃতি।